প্রকাশনার ৩৫ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

পঁয়ত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১২

ডিসেম্বর ২০২০ ॥ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭ ॥ রবি. সানি-জমা. আউ. ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

মহান বিজয় দিবস

প্রতিটি জাতির জীবনে যে দিবসগুলো তাকে সুমহান করে, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে নিঃসন্দেহে তার মধ্যে বিজয় দিবস অন্যতম। হাজার বছর ধরে পরাধীন বাঙালি জাতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ের লাল সূর্যটিকে করায়ত্ত করে। বাঙালির ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন দেশের মালিক হলো তারা। আর এই স্বাধীনতার জন্য সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করতে হলো ৩০ লক্ষ শহীদকে, চার লক্ষাধিক মা-বোনকে তাদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হলো। শুধুমাত্র তাই নয় এই স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে জেলখানায় কত সন্তান যে তার জীবন যৌবনকে উৎসর্গ করেছে সেটি জাতির ইতিহাসে আজীবন অমলিন হয়ে থাকবে। মুজিববর্ষে বিজয়ের এই পূর্তিতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহযোদ্ধা নেতৃবৃন্দসহ মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও আজ পর্যন্ত দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা শহীদদের।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সত্য ও ন্যায়ের পথে জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। সেদিন সেই যুদ্ধে মহান পবিত্র ধর্ম

ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এই দেশের কুলাঙ্গার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস'রা যুদ্ধাপরাধের মতো ঘৃণিত অনৈসলামিক কার্যক্রম এই মাটিতে পরিচালনা করছে। তারা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল, ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করতে অপচেষ্টা করেছিল। আমরা প্রত্যাশা করি তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজার কাজটি সম্পন্ন হবে। যাতে ভবিষ্যতে এই মাটিতে কেউ পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোন দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড করার সাহস পাবে না। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই বিচার সম্পন্ন করে সবগুলো দণ্ড কার্যকর করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব সারাবিশ্বের জন্যই অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব নিয়ে সারাবিশ্বে নানারকম আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা হচ্ছে। মালয়েশিয়ান সাংবাদিক প্রভিন নায়েরের *স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি?* বিষয়ে একটি প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছি। লেখাটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। লেখাটি থেকে পাঠকেরা নতুন করে আমাদের জাতির পিতাকে আবিস্কার করবেন।

১৯৭১ সালে পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজীর একটি সাক্ষাৎকারের অনুবাদও আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছি। সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানিদের গণহত্যার স্বীকারোক্তি মেলে। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারটিও পাঠকের প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করবে।

সুপ্রীম কোর্ট দিবস

১৮ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট দিবস। আমাদের আইনগত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্ট। ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে আমাদের বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট যাত্রা শুরু করেছিল। দেশের আইনের ইতিহাসে সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুপ্রীম কোর্ট নিয়ে কিছু বক্তব্যের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম বঙ্গবন্ধু ও সুপ্রীম কোর্ট বিষয়ে একটি লেখা লিখেছেন। লেখাটি পাঠকদের অনেক অজানা বিষয়কে জানতে সাহায্য করবে।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

মুফতী মো. আবদুল্লাহ
রাসূল (সা) এর দরবারের আদব-শিষ্টাচার ♦ ০৯

মহান বিজয় দিবস

মিলন সব্যসাচী
মুজিববর্ষের আলোকে বিজয় দিবসের তাৎপর্য ♦ ২৭
প্রফেসর ড. একেএম ইয়াকুব হোসাইন
জাতির জনকের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ♦ ৩৩

অনুবাদ

মূল : প্রভিন নায়ের
অনুবাদ : কাজী আখতারউদ্দিন
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি
শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি? ♦ ৪৭
সাক্ষাৎকার : আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী
অনুবাদ : গাজী সাইফুল ইসলাম
ইয়াহিয়া যদি মুজিবের কাছে ক্ষমতা
হস্তান্তর করত তাহলে পাকিস্তান অখণ্ড রয়ে যেত ♦ ৫৫
আতাতুর্ক কামাল পাশা
বিজয়ের সেই সন্ধিক্ষণে ♦ ৬৫

মুজিববর্ষ

ইসলামের খেদমতে বঙ্গবন্ধুর অবদান ♦ ৭১

সুপ্রীম কোর্ট দিবস

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
বঙ্গবন্ধু ও সুপ্রীম কোর্ট ♦ ৭৮

কবিতা

সোহরাব পাশা
স্বদেশের মুখ ♦ ৮৩
হাসান হাফিজ
ভাষা এক গোধূলিয়া শান্তিছায়া ♦ ৮৪
গোলাম নবী পান্না
স্বপ্ন-বিজয় ♦ ৮৫
মঈনুল হক চৌধুরী
মুক্তিযুদ্ধ ♦ ৮৬
আবদুস সালাম খান পাঠান
হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ♦ ৮৭
শফিক তালুকদার
লাল সবুজ পতাকা ♦ ৮৮
কাজী জাহাঙ্গীর
বাঙালি মহানায়ক ♦ ৮৯
মিজানুর রহমান
প্রার্থনা ♦ ৯০

গল্প

মুস্তাফা মাসুদ
বিপ্রতীপ ♦ ৯১

স্মরণ

ড. মাহফুজ পারভেজ
মির্জা গালিবের শেষ দিনগুলো ♦ ১০৫
জব্বার আল নাঈম
মসনবীয়ে রুমি : বন্ধুত্বের প্রোজ্জ্বল বন্ধন ♦ ১১৫

বই আলোচনা

ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছেন আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান ♦ ১২৫

পরশমণি

আল-কুরআন

১। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা আনকাবুত: ৬৯)*

২। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার হয়েছে। *(সূরা হজ্জ: ৬৯)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা: ২৫৪)*

৪। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসি জালিম, ইহা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানাও। যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। *(সূরা নিসা: ৭৫-৭৬)*

৫। আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, নিধন করে ও শহীদ হয়। তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি হয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? তোমরা যে সাওদা করেছ সে সাওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।। *(সূরা তাওবা: ১১১)*

আল-হাদীস

১। মাতৃভূমি মক্কাকে ছেড়ে প্রিয় নবী (সা) অশ্রুসজল নয়নে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে হতে মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: হায়রে আমার জন্মভূমি মক্কা! দুনিয়ার জনপদগুলোর মধ্যে তুমিই আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়। আমি তোমাকে অন্যান্য ভূ-খণ্ডের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। ইসলামের শত্রুরা যদি তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য না করত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। *(তিরমিযি, ইবনে মাযাহ শরীফ)*

২। ফুলাদাহ ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশের সীমান্ত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে। *(আবু দাউদ, তিরমিযি শরীফ)*

৩। হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি: এক রাত ও একদিন ধরে দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস যাবত দিনে সিয়াম পালন করা এবং রাতে সালাত আদায় করার চেয়ে বেশি মূল্যবান। এই দায়িত্ব পালনকালে যদি সে মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করছিল মৃত্যুর পরেও তা তার জন্য জারি থাকবে এবং জারি থাকবে তার রিয্‌কও। কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

৪। হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি আল্লাহর পথে একদিন দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিন অন্যান্য পাহারা ও ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে শ্রেয়। *(তিরমিযি শরীফ)*

রাসূল (সা) এর দরবারের আদব-শিষ্টাচার

মুফতী মো. আবদুল্লাহ্

প্রসঙ্গঃ ‘মানব জীবনের দিবারাত্রির কর্মকাণ্ড উদাহরণত উঠাবসা, মেলামেশা, লেনদেন এর উত্তম নিয়ম-নীতিকে আদব-শিষ্টাচার বলা হয়’। এসব আদব যত্নসহ পালনের দ্বারাই মানুষ সভ্যতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, ভদ্র হয়ে থাকে, অভিজাত বলে গণ্য হয়ে থাকে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি জীবন চলার আদবের প্রতি যত্নবান হয় তাহলে অপরাপর লোকজনকে অধিক প্রশান্তি পৌঁছাতে পারে এবং তাদের অশান্তি ও মন-বেদনার কারণ হয় না। এটা সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা যে, অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্ম এক স্থান থেকে গ্রহণ করেছে এবং আদব অন্য স্থান থেকে গ্রহণ করেছে। উদাহরণত খ্রিস্টানরা ধর্ম নিয়েছে ইঞ্জিল থেকে; কিন্তু সামাজিকতার আদব অর্জন করেছে রোম ও ইতালি থেকে। ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা যে, তা ঈমান, ইবাদত, চরিত্র-আচরণ ও আদব-সভ্যতার আদর্শরূপে মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শকে মূল উৎস ও মাপকাঠি হিসাবে বেছে নিয়েছে। এটাই হচ্ছে কারণ যে, ইসলাম হিংস্রতম

সম্প্রদায়ের কাছেও কুরআন ও নিজ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী নিয়ে তথায় পৌঁছেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাদেরকে সভ্য ও ভদ্র জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। এ তো হল, সাধারণ মানবতার আদব-শিষ্টাচার। দো-জাহানের সরদার মহানবী (সা) যেমন সকল মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; তাই তাঁর বেলায় আরও উচ্চমানের আদব প্রদর্শন মুসলিম সমাজের নৈতিক ও শরঈ দায়িত্ব; যার কিছুটা ঝলক নিম্নে আমরা তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে–'হে আমার প্রিয়নবী! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি এ বিশ্ব জগতকে সৃষ্টিই করতাম না।' অর্থাৎ যদি বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) এ ধরাধামে না আসতো তাহলে এসব জিন ও মানুষ, সূর্য ও চন্দ্র, গাছ ও পাথর, জল ও স্থল, ফুলের সৌরভ, চড়ুই পাখিদের আনাগোনা, সবুজের সমারোহ, আকাশ-পাতাল, উঁচু-নিচু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, ভূমির আর্দ্রতা, সূর্যের প্রখরতা, নদীর স্রোত, আকাশের নক্ষত্র, শরৎ ও বসন্ত, মরুভূমি ও উটপাখি, তরুলতা ও জড় পদার্থ, সোনা-রূপা ও খনিজ সম্পদ, বনের হিংস্র প্রাণি, বাতাসে উড়ে-বেড়ানো পাখি, মোটকথা বিশ্ব জগতের কোন বস্তুর নাম-চিহ্নও অস্তিত্বে আসতো না।

বিশ্ব-চরাচরের অহঙ্কার, শ্রেষ্ঠজনদের শীর্ষ-মনীষী, সর্ব-জগতের প্রভুর সর্বাধিক প্রিয়ভাজন নবী মুহাম্মদ (সা) নিম্নোক্ত গুণাবলির আধার:

১। যাঁর খাতিরে এ বিশ্বচরাচর অস্তিত্ব পেয়েছে।

২। যাঁর বরকতে মানবতা বিবেক-সম্বিত প্রাপ্ত হয়েছে।

৩। যাঁর গলায় 'যদি আপনি না হতেন'-এর হার পরিধান করানো হয়েছে।

৪। যাঁকে 'ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক' (আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি) এর মুকুট পরিধান করানো হয়েছে।

৫। যাঁর সম্মানীত নামের দ্বারা বেহেস্তী বৃক্ষসমূহের প্রতিটি পাতা-পল্লব রূপ-সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়েছে।

৬। যাঁর নামের বরকতে হযরত আদম (আ)-এর তাওবা কবূল হয়েছে।

৭। যাঁর বরকতে হযরত ইবরাহীম (আ) নেতৃত্বের উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

৮। যাঁর কালিমা হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটির ওপর খচিত ছিল।

৯। যাঁর রূপ-সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব হযরত ইউসুফ (আ) প্রাপ্ত হয়েছেন।

১০। যাঁর ধৈর্য-সবরের নমুনা হযরত আইয়ূব (আ) প্রাপ্ত হয়েছেন।

১১। যাঁর প্রাপ্ত নৈকট্যের এক মুহূর্ত হযরত মূসা (আ)-এর মাওলার সঙ্গে বাক্যালাপের আকারে ভাগ্যে জুটেছে।

১২। যাঁর সম্মান-মর্যাদার একাংশ মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির আকারে হযরত হারুন (আ) প্রাপ্ত হয়েছেন।

১৩। যাঁর শানে রচিত না'ত এর একটি পঙক্তি হযরত দাউদ (আ) এর সুরের উৎস হয়েছে।

১৪। যাঁর পূতঃপবিত্রতার ঘ্রাণ নবীগণের 'নিষ্পাপ' হওয়ার পথ আলোকিত করেছে।

১৫। যাঁর বিজ্ঞ দর্শনসুলভ জ্ঞানভান্ডারের একটি লাইন হযরত লোকমান (আ) এর ভাগ্যে জুটেছে।

১৬। যাঁর সুউচ্চ মান-মর্যাদার একটি ঝলক হযরত ঈসা (আ) এর ভাগ্যে জুটেছে।

১৭। যাঁর পুণ্যবান অস্তিত্ব হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর দুআ' ও হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর অলৌকিক জন্মের উৎস বটে।

১৮। যাঁর আগমন সূত্রের বরকতে আবরাহার সৈন্যরা 'কর্তিত শস্যে' পরিণত হয়েছিল।

১৯। যাঁর শুভ জন্মের দ্বারা পারস্যের উপাস্য অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছিল।

২০। যাঁর ফয়েয ও বরকতপূর্ণ মুখে দোলনায় শায়িতাবস্থায় শৈশবে 'আল্লাহু আকবার' বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

২১। যিনি নবী হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই 'আল্-আমীন' তথা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

২২। যাঁর 'রাসূল' হওয়ার সাক্ষ্য জড়পদার্থও প্রদান করেছে।

২৩। মি'রাজ এর মত অলৌকিক সুমহান ঘটনা একমাত্র তাঁরই ভাগ্যে জুটেছে।

২৪। যাঁর পবিত্র দরবারের দ্বাররক্ষী সিদ্দীক আকবরের মত মনীষী হয়েছেন।

২৫। যাঁর ঈমানের ভান্ডার এর প্রভাবে ফারূকে আ'যম (রা) ঈমান প্রাপ্ত হয়েছেন।

২৬। যাঁর লজ্জাশীলতার জ্যোতির প্রভাবে উসমান (রা) যিন্নুরাইন হয়েছেন।

২৭। যাঁর জ্ঞানসমুদ্রের ফোঁটাসমূহের দ্বারা আলী মুরতাযা (রা) 'বাবুল-ইলম' হয়েছেন।

২৮। যাঁর শহরকে বিশ্বজগতের মালিক বা'লাদে-আমীন' বলেছেন।

২৯। যাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে মহান আল্লাহ্ 'কিতাবে-মুবীন' বলেছেন।

৩০। যাঁর প্রতি মহান প্রভু ও তাঁর ফেরেশতারা দরূদ পাঠান।

৩১। যাঁর উম্মতকে মহান রব নিজেই 'শ্রেষ্ঠতম উম্মত' নামে উল্লেখ করে থাকেন।

সেই বিশিষ্ট রাসূলগণের মধ্যেও যিনি আরও বিশিষ্ট তাঁর প্রতি আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

'নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাঁকে যথাযথ আদব- সম্মান কর। *(সূরা: আল-ফাত্হ : ৮-৯)*

পবিত্র কুরআন হতে উদাহরণসমূহ

মহানবী (সা)-এর প্রতি আদব রক্ষা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকটি উদাহরণ বিদ্যমান–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না'। *(আল-হুজুরাত : ২)*

আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (র) উক্ত আয়াতের অধীনে লিখছেন: 'মহানবী (সা)-এর মজলিসে হৈচৈ করবে না। যেমনটি নিজেরা পরস্পর নির্দিধায় রাগের স্বরে, ত্যাক্ত-বিরক্তির স্বরে ঝটপট করে থাক। মহানবী (সা)-এর ক্ষেত্রে তেমনটি আদব-পরিপন্থী আচরণের নামান্তর। তাঁর সঙ্গে সম্বোধনের প্রয়োজনে নম্রস্বরে, সম্মান-মর্যাদাসহ, আদব-ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেখুন, একটি ভদ্র পুত্র তার পিতার সঙ্গে, সুযোগ্য ছাত্র তার শিক্ষকের সঙ্গে, নিষ্ঠাপূর্ণ মুরীদ তার শায়খ-পীরের সঙ্গে এবং একজন সৈনিক তার অফিসারের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে? একজন নবীর মর্যাদা তো এসবের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে! মহানবী (সা)-এর সঙ্গে বা তাঁর ব্যাপারে বাক্যালাপ কালীন পূর্ণরূপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, আল্লাহ না করুক যদি তাঁর সঙ্গে বা শানে বে-আদবী হয়ে যায় এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যায় তাহলে একজন মুসলমানের আর কোন আশ্রয় থাকলো না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার এবং সারা জীবনের সব শ্রম-সাধনা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।'

'মুসনাদে বাযযার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহর শপথ! এখন তো আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলবো যেভাবে কেউ কানে-কানে কথা বলে থাকে'। 'দুররে মানছূর' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত ঘটনার পর হযরত উমর (রা) অনেক নীচুস্বরে মহানবী (সা)-এর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসারদের উচ্চস্বরবিশিষ্ট খতীব হযরত সাবিত ইবন কায়েস (রা) যখন এ আয়াতটি শুনলেন তখন তিনি

গৃহে নির্জনে অবস্থান করতে লাগলেন। সা'আদ ইবন মায়া'য (রা) একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অবস্থা? তিনি বলতে লাগলেন– 'অবস্থা ভালো না, যে তার আওয়ায মহানবী (সা)-এর আওয়াযের চেয়ে বড় করবে তার তো সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামী হয়ে যাবে (আমিও তো তার একজন)'।

হযরত সা'য়াদ ইবনে মায়'ায (রা) এ অবস্থা যখন মহানবী (সা)-এর কাছে পেশ করলেন তখন মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, তোমরা তাকে গিয়ে বল, 'আপনি জাহান্নামী নন, আপনি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী'। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে কেউ একটু উচ্চস্বরবিশিষ্ট হওয়াতে বাক্যালাপ কালীন আওয়ায একটু বড় হয়ে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য। তারপরও যথাসাধ্য আওয়ায যেন বড় হয়ে না যায়, সচেষ্ট থাকবে। কারণ, এটাই হচ্ছে আদবের দাবি। মহানবী (সা)-এর প্রতি এ আদব প্রদর্শন যেভাবে তাঁর বরকতপূর্ণ জীবদ্দশার ক্ষেত্রে অবশ্য জরুরী ছিল একইভাবে তা তাঁর ইন্তেকাল পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রেও অবশ্যই জরুরী বলে গণ্য। আজও মসজিদে নববী (সা)-এর রওজা শরীফের দিকের দেওয়ালের গায়ে উক্ত আয়াতটি খোদাই করে লিখিত আকারে বিদ্যমান। যিয়ারতকারীদের জন্য জরুরী পবিত্র রওজা শরীফে উপস্থিতির সময়, সালাত ও সালাম পাঠ কালীন নিজ নিজ আওয়ায নীচু রাখা চাই।

উদাহরণ–২

পবিত্র কুরআনের যেখানে যেখানে পূর্ববর্তী উম্মতদের নিজ নিজ নবীগণের সঙ্গে বাক্যালাপের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে চিন্তা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা নবীগণের নাম ধরে সম্বোধন করতো। উদাহরণত, বনী-ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে কথোপকথন কালীন বলেছে–'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করবো না' *(বাকারা : ৬১)*।

একইভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গীগণ এভাবে বলেছিল–-'হে মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাতে সক্ষম?' *(আল-মায়েদা : ১১২)*।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথমত তারা নাম ধরে আল্লাহর নবীগণের সঙ্গে কথা বলতো, দ্বিতীয়ত তাদের কথোপকথনের ধারাও এমন ছিল, যেমনটি তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ করছে। যেহেতু এমনটি বে-আদবীর কাতারে গণ্য, তাই আল্লাহ তা'য়ালা উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-কে এমন ধারার বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর ইরশাদ হচ্ছে–'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না;' *(আন-নূর : ৬৩)*।

সাহাবাগণের আনুগত্য, মান্যতা ও সর্বোত্তম আদবের অনুশীলনের ব্যাপারে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা চাই, উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণের পর যখনই তাঁরা মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করতেন তখনই তাঁরা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'ইয়া নাবীআল্লাহ', 'ইয়া হাবীবাল্লাহ'-বলতেন এবং তার পাশাপাশি এমনটিও বলতেন 'আপনার জন্য আমার পিতা-মাতাও জীবন উৎসর্গ করুক'–সুবহানাল্লাহ্!

উদাহরণ–৩

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সাদাকাহ্ পেশ কর' *(আল-মুজাদালাহ: ১২)*।

আয়াতটির শানে-নুযূল হচ্ছে, মদীনার মুনাফিকরা লোকজনের মাঝে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের লক্ষ্যে এমন পন্থা অবলম্বন করেছিল যে, মহানবী (সা)-এর সঙ্গে কানে-কানে কথা বলার রীতি অনুসরণ করছিল। যাতে প্রত্যক্ষকারীরা এমন ধারণা নেয় যে, বাক্যালাপকারী একজন বড় কেউ এবং তিনি বিশেষ কোন কথাবার্তা বলছেন। কোন কোন সরল-সহজ মুসলমানও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার ক্ষেত্রেও তেমন পন্থা অনুসরণ করছিলেন। যেহেতু এ সবই নবীর প্রতি আদব প্রদর্শনের পরিপন্থী ছিল তাই আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ প্রদান করলেন, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নবীর সঙ্গে কানকথা বলতে চাইবে তখন কিছু হাদিয়া দিয়ে দিবে। এতে লোকজন যখন নিজেদের ভুল কর্মপন্থার বিষয়টি অনুভব করতে পারলো, এমন কর্মপন্থা পরিত্যাগ করলো। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত নির্দেশ রহিত করে দিয়ে মুসলমানদের প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন।

আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (র) লিখছেন, 'যখন উক্ত বিধানটি অবতীর্ণ হলো তখন মুনাফিকরা কৃপণতার দরুন সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করলো এবং মুসলমানরাও বুঝে গেল যে, অধিক কানাকানি করা আদব পরিপন্থী যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না'।

উদাহরণ–৪

মহান আল্লাহর ইরশাদ করছেন–'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না' *(হুজুরাত: ০১)*।

মহান আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্য তাঁর রাসূলের প্রকৃত আনুগত্যের মধ্যে লুকায়িত। আর আনুগত্য ও মান্যতা বিষয়টির সম্পর্ক হয়ে থাকে আদবের সঙ্গে। তাই আয়াতটিতে মুসলিম উম্মাহকে নবীর প্রতি আদবের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সাহাবাগণ যেহেতু প্রিয়নবীর সাহচর্য প্রাপ্ত ছিলেন তাই তাঁরা অন্তরের দিক থেকে তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি বাহ্যিকভাবেও মহানবী (সা)-এর আদবের প্রতি এত বেশি যত্নবান ছিলেন যে, কোন কাজেই মহানবী (সা) থেকে অগ্রণী হতেন না। কথা বলতেন নীচুস্বরে, মজলিসে বসতেন এমনভাবে যেন

মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তাঁদের অন্তর মহানবীর প্রেমাগ্নিতে ভরপুর ছিল; তাঁদের দিবারাত্রির পুরো সময় ছিল নেক আমলে পরিপূর্ণ এবং তাঁদের পুরো জীবনই ছিল সর্বপ্রকার বে-আদবী হতে মুক্ত। যে-কারণে তাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল–'তাঁরা এমন যে, মহান আল্লাহ তাঁদের অন্তরের তাকওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। (যার ফল) তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(প্রাগুক্ত: ০৩)*।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোকে একত্র করে চিন্তা করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে যায় যে, একদিকে রাব্বুল-আ'লামীন আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে মহানবী (সা)-এর ব্যাপারে আদব রক্ষার নির্দেশ প্রদান করেছেন, অন্যদিকে তেমন সবকিছুর গোড়া কর্তন করে দিয়েছেন যা নবীর ক্ষেত্রে আদব-পরিপন্থী। যেখানে আদব রক্ষার কথা বলেছেন সেখানে বে-আদবী থেকেও বেঁচে থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মোটকথা নিজ সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় প্রকারের বিষয়গুলোই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাহাবাকিরাম এমন উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যা আজও উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে তাঁদের ঘটনা-সম্ভার হতে উদাহরণরূপে কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

সাহাবা কিরাম (রা)-এর ঘটনাবলি

উদাহরণ–১

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন ঘটনার সময় মহানবী (সা) হযরত উসমান (রা)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সন্ধি স্থাপনের জন্য মক্কা পাঠালেন। নিজে ব্যক্তিগতভাবে সকল সাহাবাদের সঙ্গে হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা) মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। কিন্তু তারা ওই বৎসর মুসলমানদের উমরার অনুমতিদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। কয়েকদিনের অনবরত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া গেল না। মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ তাদের নিজ হঠধর্মী সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। কয়েকজনে হযরত উসমান গনী (রা)-কে প্রস্তাব দিল যে, ব্যক্তিভাবে আপনি নিজে যদি উমরা করতে চান তার অনুমতি আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা) জবাবে বললেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমার মনিব রাসূল (সা)-কে তাওয়াফ করতে বাধা দেওয়া হবে আর সেখানে আমি নিজে একা তাওয়াফ করে নেব? মক্কার কুরায়শদের অন্তরে এ বিষয়টি বজ্রাঘাতের মতো আঘাত হানলো। তারা এমনটি ধারণাই করতে পারেনি যে, রাসূল (সা)-এর অনুসারী গোলামদের আদব ও প্রেমাবেগ এমন উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়ে গেছে! হযরত উসমান গনী (রা) যখন ফিরে আসলেন তখন কোন

কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি তাওয়াফ করে এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমি যদি সেখানে এক বছরও অবস্থান করতাম অথচ আমার মনিব প্রিয় নবী (সা) হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছেন; তাহলে আমি প্রিয়নবীকে ছাড়া কক্ষনো তাওয়াফ করতাম না।'

হযরত বুসিরী (র) হামযাবিশিষ্ট কাসিদায় কত উত্তমরূপে বলেছেন–'হযরত উসমান (রা) বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার কারণ, কোনো দিক থেকেই তা নবী করীম (সা)-এর কাছে ছিল না। তাই তার (উমরা-তাওয়াফের) পরিবর্তে প্রিয়নবীর নূরানী হস্তে বায়'আতে রেদওয়ানের মাধ্যমে তাঁরা পেয়ে গেলেন দ্বিগুন আমলের প্রতিদান। এটা কেবল আদবেরই ফল ছিল। কতই না উত্তম আদবের অনুশীলন ছিল মহানবীর সঙ্গী-সাথীদের।'

হযরত উসমান গনী (রা) লজ্জা-শালীনতা ও আদবের গুণে অপরাপর সাহাবাদের থেকে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি বলতেন, যখন আমি মহানবী (সা)-এর কাছে বায়'আত নিলাম তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনও ডানহাত নিজ লজ্জাস্থানে স্পর্শ করিনি (বা আদব বা নসীব)।

উদাহরণ–২

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন মক্কার কুরায়শগণ উরওয়া ইবন মাসউদ সাকাফীকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালো যেন সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারণ করা যায়। উরওয়া উচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিল। সে মুসলমানদের সৈন্যের মাঝে পৌঁছেই প্রতিটি বস্তুরই সমীক্ষা চালাতে শুরু করলো। এমনকি সে মহানবী (সা)-এর দরবারে বসাবস্থায়ই বাক্যালাপ কালীন কানিচোখে সাহাবাদের আচার-আচরণ, নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তারপর যখন সে মক্কার কুরায়শদের কাছে ফিরে গেল তখন নবীভক্ত পতঙ্গদের ব্যাপারে তার নিম্নোক্ত অভিব্যক্তি বর্ণনা করলো–

'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র শপথ আমি বহু রাজা-বাদশাহদের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছি। আমি কায়সার, কিস্‌রা ও নাজ্জাসী বাদশাহ্‌র দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোথাও এমন বাদশাহ্ কখনও দেখিনি, যাকে তার সঙ্গী-সাথীরা এমন চরম পর্যায়ের ইয্‌যত-সম্মান প্রদর্শন করে যা কিনা মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর সাহাবীরা করে থাকে। তিনি যখন তাদের কোন বিষয়ের নির্দেশ দেন তারা তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তিনি যখন উযূ করেন, তারা তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে অনেকটা যুদ্ধের অনুরূপ কাড়াকাড়ি, ভাগাভাগি শুরু করেন। তিনি যখন কথা বলেন, তারা একেবারে চুপচাপ হয়ে তাঁর কথা

শুনতে থাকেন। আর তাঁর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবশত তাঁরা তাঁর দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়েও থাকে না।'- *(মুসলিম)*

সাহাবা কিরাম (রা)-এর মহানবী (সা)-এর প্রতি আদব প্রদর্শনের সাক্ষ্য এর চেয়ে উত্তম বাক্যে পেশ করা অবশ্যই সুকঠিন। কারো প্রশংসা যদি শত্রুর মুখে উচ্চারিত হয় তখন তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেসব পবিত্র মনীষীই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য যারা নিজেদের আদব-শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের স্বীকারোক্তি প্রদানে শত্রুদেরও বাধ্য করেছিলেন।

'আদব এমন এক রাজমুকুট যা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে ভাগ্যে জুটে থাকে। তা নিজ মাথায় পরিধান করো এবং যেথায় ইচ্ছা গমন করো (ইয্যত পাবে)'।

উদাহরণ–৩

হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর চাচা ছিলেন। তবে বয়সের দিক থেকে তেমন পার্থক্য ছিল না। একদা মহানবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–'আপনি কি আমার চেয়ে বেশি বড়?' বাক্যটি শুনেই হযরত আব্বাস (রা) কেঁপে উঠলেন এবং বললেন–'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই বড়, মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ; তবে আমি বয়সে একটু বেশি'।

উক্তরূপ আরেকটি ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) বয়সের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বড় না কি মহানবী (সা) বড়?' ওই সাহাবী উত্তরে বললেন, 'মহানবী (সা) আমার চেয়ে অনেক বড়, তবে জন্মের দিক থেকে আমার জন্ম পূর্বে হয়েছে' *(কাশফুল-গুম্মাহ : আল্লামা শা'রানী)*।

এসব থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সাহাবাগণ নিজেদের মাঝে সাধারণ বাক্যালাপ এর ক্ষেত্রেও এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না যা দ্বারা বে-আদবীর আভাষ পাওয়া যেতে পারে। মহানবী (সা)-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধের আবেগ-অনুভূতি তাঁদের জীবনের পরতে পরতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, দ্রুত বাক্যালাপ কালীনও আদব-পরিপন্থী কোন শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বের হতো না।

উদাহরণ–৪

'শামায়েলে তিরমিযি' গ্রন্থে হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত যে, বিশেষ কোন প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক যদি সাহাবা কিরাম (রা)-এর কারও মহানবী (সা)-এর গৃহের দরজায় কড়া নাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হতো তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁরা আদব রক্ষার্থে নিজ নখের দ্বারা কড়া নাড়তেন। উদ্দেশ্য হয়ে

থাকতো, যেন অবগতিও হয়ে যায় এবং উচ্চ আওয়াজের দরুন যেন মনে কষ্টও না লাগে।

উদাহরণ–৫

মক্কার কুরায়শদের সর্দার আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা (রা) মুসলমান হয়ে গেলে মহানবী (সা) তাঁকে নিজ স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য করেছেন। আবূ সুফিয়ান তখনও মুসলমান হননি। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল তখন মক্কার কুরায়শরা ওই চুক্তির মেয়াদ পুনঃ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবূ সুফিয়ানকে নির্বাচিত করে পাঠালেন। আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের দূত হিসাবে পবিত্র মদীনা নগরীতে পৌঁছলেন এবং নিজ কন্যা উম্মে হাবীবা (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হলেন। একটি চৌকির ওপর মহানবী (সা)-এর বরকতপূর্ণ বিছানা বিছানো ছিল। আবূ সুফিয়ান যখনই তার ওপর বসতে চাইলেন তখনই হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বিছানাটি সরিয়ে ফেলে নিজ পিতাকে খালি চৌকির দিকে ঈঙ্গিত করে বললেন, 'আব্বাজান বসুন'! আবূ সুফিয়ান পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি, তাই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিছানা কি আমার বসার যোগ্য নয়, না কি আমি তার ওপর বসার যোগ্য নই? উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, আব্বাজান! এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিছানা! আবূ সুফিয়ান বললেন, তাতে কি হয়েছে, সে তোমার স্বামী আর আমি তো তোমার পিতা। মুমিন জননী উত্তর দিলেন, তাতো ঠিক বটে; কিন্তু আপনি তো এখনও মুশরিক অবস্থায় আছেন অথচ প্রিয়নবী (সা)-এর বিছানাটি পবিত্র। যে-কারণে আমার মনে সায় দিচ্ছে না যে, আপনার অপবিত্র দেহ আমার মনিব (সা)-এর বিছানায় লাগুক। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবীপ্রেম ও নবীর ভালোবাসা কাকে বলে?

উদাহরণ–৬

মসজিদে নববীতে খুৎবাদানের জন্য কাঠের একটি মিম্বর বানানো হয়েছিল; যার তিনটি সিঁড়ি ছিল। মহানবী (সা) যখন খুৎবা দিতে দাঁড়াতেন তখন সবচেয়ে ওপরের সিঁড়িতে বসে মধ্যের সিঁড়িতে পা মুবারক রাখতেন । হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন খুৎবাদানের জন্য মধ্যের সিঁড়িতে বসতেন এবং নিচের সিঁড়িতে পা রাখতেন। হযরত উমর ফারূক (রা) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি খুৎবাদানের জন্য একেবারে নিচের সিঁড়িতে বসতেন এবং মেঝেতে পা রাখতেন। হযরত উসমান গনী (রা) এর সময় যখন এল তখন তিনি মিম্বর এর সিঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিলেন এবং খুৎবাদানকালে তিনি নতুন বৃদ্ধিকৃত অংশের প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়াতেন। খোলাফায়ে রাশেদার উক্ত কর্মপন্থা অবশ্যই আদব প্রশ্নে উম্মতের জন্য দলিল হিসাবে গণ্য।

উদাহরণ–৭

ইন্তেকালের পূর্বে যখন মহানবী (সা)-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেল তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, 'আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মসজিদে লোকজনকে নিয়ে নামাযের ইমামতি করবেন।' যে কারণে মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর (১৭) সতের ওয়াক্ত নামায পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। ওফাত শরীফের দু'দিন পূর্বে যোহরের নামাযে হযরত আবূ বকর (রা) ইমামতি করছিলেন, এমতাবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা) হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে জামাতে শরীক হতে উপস্থিত হলেন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন যে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সা) তাশরীফ এনেছেন তখন তিনি নামাযের ভেতরেই ইমামতের মুসাল্লা হতে পিছনে সরে আসতে উদ্দত হলেন। মহানবী (সা) হাতের ইশারায় তাঁকে সরে আসতে নিষেধ করলেন। অতপর মহানবী (সা) হযরত আবূ বকরের পাশে বসে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)-এর ইক্তেদা করে এবং অন্য সকল সাহাবী হযরত আবূ বকরের ইক্তেদা করে– এভাবে ওই নামায সম্পাদিত হলো। নামায শেষে হুযূর (সা) হযরত আবূ বকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নামাযের মধ্যে পিছনে সরে এলেন কেন?' তিনি উত্তরে বললেন: 'আবূ কুহাফার পুত্রের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, মহানবী (সা)-এর সামনে নামায পড়বে'।

হযরত আবূ বকর (রা) নিজ কর্মের দ্বারা এটি প্রমাণ করে দিলেন যে, সাহাবাগণ– মহান আল্লাহর উক্ত নির্দেশকে কত নির্দ্বিধায় কার্যত আমল করে দেখিয়েছিলেন।

উদাহরণ–৮

একদা হযরত ফাদীলাহ ইবন উবায়দ আসলামী (রা) ও হযরত ইবন ওরা' (রা) পরস্পর তীর প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতায় রত ছিলেন। কোন কারণে মহানবী (সা) ওই স্থান অতিক্রম করেন। হুযুর (সা) হযরত ফাদীলা (রা)-কে বললেন, "হে ইসমাঈল-বংশধর! তুমি তীর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাও! তোমাদের পিতাও ভালো তীর শিকারী ছিলেন। তুমি তীর চালাতে থাকো, আমি কিন্তু ইবনে ওরা' এর পক্ষে আছি।" এ বাক্য শুনেই হযরত ফাদীলা তীর-ধনুক রেখে দিলেন এবং আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি যদি ইবনে ওরা' এর সঙ্গে থাকেন তাহলে আদবের দাবি মোতাবেক আমি তীর প্রতিযোগিতায় আর তীর নিক্ষেপ করতে পারি না। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা তো অবস্থানগত সমান পর্যায়ে হতে পারে। আমার পক্ষে কিভাবে শোভনীয় হতে পারে যে, আমি আপনার সমান্তরালে দাঁড়াবো, হোক তা তীর নিক্ষেপ প্রশ্নেই'। *(বোখারী শরীফ)*

উদাহরণ–৯

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমরা যখন হুযুর (সা)-এর সঙ্গে দস্তরখানে উপস্থিত থাকতাম তখন ওই সময় পর্যন্ত খাবারে হাত লাগাতাম না যে পর্যন্ত মহানবী (সা) শুরু না করতেন। যেহেতু মনিবের উপস্থিতিতে একজন দাসের কোন কাজে প্রথমে কিছু করতে যাওয়া বে-আদবী মনে করা হয় সে-কারণে সাহাবা কিরাম (রা) খাবার গ্রহণেও প্রথমে শুরু করতেন না।

উদাহরণ–১০

মহানবী (সা) যখন হিজরত করে মদীনা শরীফে গেলেন তখন তিনি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করলেন। ওই বাড়ীটি দ্বিতলবিশিষ্ট ছিল। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে ওপর তলাতে থাকলেন এবং প্রিয়নবী (সা) নিচ তলাতে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে ডুবে ছিলেন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর মনে জাগলো, মহানবী (সা) নিচে অবস্থান করছেন আর আমি ওপরে! এটা তো স্পষ্ট বে-আদবী হয়ে যাচ্ছে! এ অবস্থাতেই অর্ধ-রাতের কালে বিছানা থেকে পৃথক হয়ে কক্ষের দেয়ালের সঙ্গে টেক লাগিয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর মহানবী (সা)-এর কাছে এসে শত-সহস্রবার অনুনয়-বিনয় করে হুযুর (সা)-কে ওপর তলায় অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে নিচ তলাতে পরিবার-পরিজনসহ থাকতে লাগলেন (বা-আদব বা নসীব)।

উদাহরণ–১১

'দুররে মানসূর' কিতাবের বর্ণনা হচ্ছে, একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অপবিত্রতার গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। ওই অবস্থায় হুযুর (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) দ্রুত কোথাও লুকিয়ে গেলেন। তারপর গোসল সেরে হুযুর (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলেন। নবীজী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার কাছে বে-আদবী মনে হয়েছিল। এখন আমি পাক-পবিত্র হয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, একবার হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর সঙ্গে মহানবী (সা) মোসাফাহা করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গোসলের প্রয়োজনের কথা ওযর হিসাবে পেশ করলেন।

উক্তসব বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবা কিরাম (রা) অপবিত্র অবস্থায় মহানবী (সা)-এর পবিত্র শরীর এর সঙ্গে নিজেদের হাত মেলানোতেও বে-আদবী মনে করতেন।

উদাহরণ–১২

সাহাবা কিরাম (রা) যখনই মহানবী (সা)-এর মাহফিলে বসতেন আদবের প্রতি লক্ষ করে নিজেদের মুখমন্ডল নিচু করে রাখতেন। হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সা) যখনই আনসার ও মুহাজির সাহাবাদের মাঝে উপবিষ্ট থাকতেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) ব্যতীত কেউই নিজ দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী করতেন না। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সঙ্গে হুযুর (সা)-এর সম্পর্ক ছিল বিশেষ-ব্যতিক্রম। প্রিয়নবী (সা) তাঁদের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসতেন এবং তাঁরাও মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারকের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসতেন। অনেকটা প্রেম ও ভালোবাসার আন্তরিক আবেগ যেন মুচকি হাসির মাধ্যমে প্রকাশ পেত।

উদাহরণ–১৩

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-এর মজলিসের চিত্র এঁকেছেন এভাবে–'যখন মহানবী (সা) কথা বলা শুরু করতেন তখন তাঁর সাহাবাগণ এমনিভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন, যেমন কিনা তাঁদের মাথার ওপর পাখী বসে আছে। যখন হুযুর (সা) চুপ হয়ে যেতেন তখন উপস্থিতগণের মধ্য থেকে (প্রয়োজনে) কোন একজন কথা বলতেন। আলোচনার মধ্যখানে কেউ মহানবী (সা)-এর সঙ্গে কথা বলতেন না।'

পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাসীনদের অনুষ্ঠানেও তেমন আদব প্রদর্শন অনেক বিরল। কেননা আদবের সম্পর্ক হচ্ছে আন্তরিক আস্থা ও প্রেমের সঙ্গে। দুনিয়াদারদের সেই দান ভাগ্য জুটবে কোত্থেকে?

উদাহরণ–১৪

একদা হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)-এর অন্দর মহলে প্রবেশ করে নিজ কন্যা আয়েশা (রা)-কে প্রিয়নবী (সা)-এর চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিজ কন্যার নবীজী (সা)-এর দরবারে এমন বে-আদবীপূর্ণ আচরণ দেখে মারাত্মক ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। যে-কারণে তিনি অনেক জোরে তাঁকে একটি চড় মেরেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) নবীজীর (সা) আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

উদাহরণ–১৫

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কতৃক বর্ণিত, মহানবী (সা) আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন, তারপর তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমরা আদব হিসাবে দাঁড়িয়ে যেতাম *(নাসাঈ, আবূ-দাউদ)*।

উদাহরণ–১৬

হযরত যুরা'(রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল-কায়েছ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় এল তখন তারা দ্রুত নিজ নিজ বাহনের আসন থেকে নেমে মহানবী (সা)-এর বরকতপূর্ণ হাত ও পায়ে চুমু খেতে লাগলো *(আহমদ ও আবূদাঊদ)*।

উদাহরণ–১৭

হযরত ইবন উমর (রা) একবার মসজিদে নববীতে আসলেন এবং মহানবী (সা) মিম্বরের যে-স্থানটিতে বসতেন, তা হাত দ্বারা স্পর্শ করে বরকতস্বরূপ সেই হাতকে নিজ মুখমন্ডলে মুছে নিলেন (শিফা ও তাবাকাতে ইবন স'াদ)।

উদাহরণ–১৮

হযরত উমর ফারূক (রা) স্বীয় খেলাফত আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোন কোন সাহাবীর দৈনন্দিনকার ভাতা নির্ধারণ করতে গিয়ে নিজ পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমরের জন্য তিন হাজার দিরহাম বাৎসরিক ভাতা ধার্য করলেন এবং হযরত উসামা ইবন যায়েদ (রা)-এর জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাঁচশত দিরহাম। হযরত আব্দুল্লাহ নিবেদন করলেন, আপনি উসামা ইবন যায়েদ এর ভাতা আমার চেয়ে অধিক ধার্য করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, তাঁর পিতা তোমার পিতার চেয়ে এবং তিনি নিজেও তোমার চেয়ে মহানবী (সা) কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। আমি আমার প্রিয়জনের চেয়ে মহানবীর প্রিয়জনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি! নবীপ্রেম ও নবীর প্রতি আদবের কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবী-প্রেমিক সাহাবীগণ রেখে গেছেন! সুবহানাল্লাহ!

ওফাত-পরবর্তী মহানবী (সা)-এর আদব

প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি আদব-শিষ্টাচার প্রদর্শন তাঁর জীবদ্দশায় যেমন ওয়াজিব ছিল তেমনি তাঁর ইন্তেকাল-পরবর্তী সময়েও তা ওয়াজিব। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণের এক্ষেত্রে এটাই সিদ্ধান্ত। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল:

উদাহরণ-১

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মসজিদে নববীর কাছে পার্শ্ববর্তী কোন বাড়িঘরে যদি পেরাক-তারকাটা লাগানোর শব্দ শুনতেন, তাৎক্ষণিক কাউকে পাঠিয়ে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যেন কষ্ট দেয়া না হয়' (ওফাউল-ওয়াফা)।

উদাহরণ–২

হযরত আলী (রা)-এর নিজ ঘরের দরজা বানানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এতে তিনি মিস্ত্রীর সঙ্গে শর্ত করলেন, তিনি দূরে কোথাও থেকে তা বানিয়ে নিয়ে আসবেন, যাতে করে দরজাটি প্রস্তুতকালীন ঠুসঠাস শব্দ ইত্যাদির কারণে রওজা মুবারকে প্রিয়নবী (সা)-এর কষ্ট না হয়। তা পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর কেবল যথাস্থানে এনে লাগিয়ে দেবে (বা-আদব বা নসীব)।

উদাহরণ-৩

হযরত সায়েব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে-নববীতে শায়িত ছিলাম এমতাবস্থায় কে যেন আমার প্রতি ছোট একটি পাথর নিক্ষেপ করল। আমি মাথা উঠিয়ে তাকিয়ে দেখি, হযরত উমর ফারূক (রা) দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দু'জন লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওই দু'জনকে ডেকে নিয়ে এসো'। তারা কাছে এলে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে এলে?' তারা জবাবে বলল, তায়েফ থেকে। তিনি বললেন, 'তোমরা যদি এ মদীনার বাসিন্দা হতে, তাহলে তোমাদের আমি বেত্রাঘাত করতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জোরে জোরে কথা বলছো!' অথচ পাশেই প্রিয়নবী (সা) শুয়ে আছেন! (বুখারী শরীফ)।

উদাহরণ-৪

হযরত নাফে' (রা) বর্ণনা করছেন, একদা ইশার সময় হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। আকস্মিক কারও জোরে হাসার শব্দ শোনা গেল। তিনি তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পরিচয়'? সে জবাবে বলল, আমি বনু-সাকীফ গোত্রের লোক। তা শুনে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি থাকো কোথায়?' সে উত্তরে বলল, তায়েফ অঞ্চলে। তিনি বললেন, 'তুমি যদি এ মদীনার লোক হতে, তাহলে তোমাকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম। স্মরণ রাখবে, এ মসজিদে জোরে কথা বলা যায় না" কারণ পাশেই প্রিয়নবী (সা) ঘুমিয়ে আছেন!' (ওফাউল-ওয়াফা)।

উদাহরণ-৫

ইবন হুমাইদ থেকে বর্ণিত, খলিফা আবূ জা'ফর মনসূর আব্বাসী ইমাম মালেক (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে, কোন বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সে-সময়ে খলিফার সঙ্গে পাঁচশত তলোয়ারধারী বিশেষায়িত সৈনিক, নিরাপত্তা প্রহরী বিদ্যমান ছিলেন। বাক্য বিনিময় কালীন খলিফার আওয়াজ কিছুটা উচ্চস্বরে শোনা যাচ্ছিল। তখন ইমাম মালেক (র) বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! এ মসজিদে নিজের কথা উচ্চ শব্দে বলবেন না.....। অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন বিষয়টি তাঁর ইন্তেকালের পরেও ঠিক তেমনি জরুরী যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় অপরিহার্য ছিল। তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবূ জা'ফর স্বীয় কণ্ঠ নিচু করে ফেলেন।

উদাহরণ-৬

হযরত ইমাম মালেক (র) নিজের পুরো জীবন মদীনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। যখন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিত তিনি মদীনার বাইরে– মদীনার প্রান্তিক সীমানায় চলে যেতেন এবং এমনভাবে বসে প্রয়োজন সারতেন যে, তাঁর

দেহ থাকতো মদীনার সীমার ভেতরে আর মল-মূত্র পতিত হতো মদীনার সীমার বাইরে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে, জবাবে বললেন: "আমার ভয় হচ্ছে, আমার মৃত্যু আবার কিনা মদীনার বাইরে সংঘটিত হয়ে যায়!" একদিকে প্রেমাস্পদের বাড়ি-ভূমির প্রতি এতো মহব্বত-ভালোবাসা, আবার অন্যদিকে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব-শিষ্টাচার যে, স্বীয় দেহের ময়লা-নাপাকী মদীনার পবিত্র ভূখণ্ডে পতিত হোক, তা-ও সহ্য হচ্ছে না! প্রেম-ভালোবাসা ও আদব-শিষ্টাচারের প্রতি যত্নবান থাকার এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল! (বা-আদব বা নসীব)।

উদাহরণ-৭

হযরত ইমাম মালেক (র)-এর এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি মদীনা শরীফের অলি-গলিতে চলাকালীন রাস্তার একপাশ দিয়ে চলতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তরে বললেন: "হয়তো এ রাস্তার মধ্যে প্রিয়নবী (সা)-এর পা মুবারকের পদচিহ্ন বিদ্যমান অথচ তাতে আমার পা লেগে যাবে! আর তাতে আমার মারাত্মক বেআদবী হয়ে যাবে! (প্রগুক্ত)।

উদাহরণ-৮

ইমাম শাফেয়ী (র) একবার ইমাম মালেক (র)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে বাহনযোগ্য শ্রেষ্ঠ ঘোড়া বিদ্যমান; কিন্তু আপনি মদীনায় ঘোড়ায় আরোহণ করেন না কেন? তিনি জবাবে বললেন, আমার কাছে এমনটি অশোভনীয় মনে হয় যে, যে-পবিত্র ভূমিতে আমার মাহবূব-মনিবের পদ স্পর্শ করেছে-তা আমার ঘোড়ার পা দ্বারা দলিত-মথিত হোক! শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) 'জযবুল-কূলূব' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইমাম মালেক (র) মহানবী (সা)-এর আদবের প্রতি লক্ষ রেখে মদীনা শরীফে ঘোড়ায় আরোহণ করতেন না।'(প্রগুক্ত)।

উদাহরণ-৯

একদা জনৈক ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছিল, 'মদীনা শরীফের মাটি খারাপ!' ইমাম মালেক (র) তা শুনে ফাতওয়া দিয়ে দিলেন, 'লোকটিকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং কিছুদিন জেলেও বন্দি রাখতে হবে।' কেউ জিজ্ঞাসা করলো, এতো কঠোরতা কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'এ লোক তো এমন শাস্তিযোগ্য যে, তাকে হত্যা করা উচিত! তার কারণ, যে-ভূমিতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়নবী (সা) শুয়ে আরাম করছেন, সে মাটি বিষয়ে তার ধারণা, তা কিনা নষ্ট-খারাপ!' (শিফা)। জনৈক কবি কতই না উত্তমভাবে তার হৃদয় নিংড়ানো ভাব প্রকাশ করেছে এভাবে–*'আকাশের নিচে মহান আল্লাহর মহা আরশের চেয়েও অধিক স্পর্শকাতর এ (রওযা শরীফ) আদবস্থল!*
এখানে এসে জুনায়দ ও বায়েযীদ-এর মত মনীষীরাও শ্বাস বন্ধ করে হাযিরা দিয়ে থাকেন।' অর্থাৎ অনেকটা যেমন এ পবিত্র দরবারে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়াও বেআদবির নামান্তর।

উদাহরণ-১০

ইমাম মালেক (র) পবিত্র রওযা শরীফ ও মসজিদে নববীর প্রতি অনেক বেশি সম্মান প্রদর্শন করতেন। কেউ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন: (আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা যদি তোমরা দেখতে পেতে, তাহলে তোমরা আমার কর্ম-আচরণের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করতে না।) প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি তাঁর উক্তরূপ আদব-সম্মান প্রদর্শনের কারণেই তিনি প্রতিনিয়ত, অধিকহারে মহানবী (সা)-কে স্বপ্নে দেখতে পেতেন। হযরত আবূ সা'দ (র) 'হিল্ইয়া' গ্রন্থে মুসান্না ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন: 'আমার এমন কোন রাত অতিবাহিত হয়নি, যে-রাতে মহানবী (স)-কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

উদাহরণ-১১

হযরত আবূল ফযল জাওহারী উন্দুলুসী (র) মদীনা শরীফের দীর্ঘ সফরে রওয়ানা হলেন। যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে শহরের ঘরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হল, তখন তিনি বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা পড়তে পড়তে পায়ে হাঁটা শুরু করলেন– (যখন আমরা সেই সম্মানী নবীর নিদর্শন দেখলাম–যিনি তাঁর নিদর্শনের পরিচয়জ্ঞানের মত অন্তরও আমাদের তরে রেখে যাননি, বিবেকও ছেড়ে যাননি। আমরা বাহন থেকে নেমে পড়লাম এবং সেই মহিয়ান সত্তার সম্মানার্থে পায়ে হাঁটতে লাগলাম, বাহনে আরোহিত অবস্থায় যাঁর যিয়ারত অবশ্যই আদব পরিপন্থী।)

উদাহরণ-১২

শায়খুল ইসলাম হাফেয আবুল-ফাত্হ তাকীউদ্দীন ইবন দাকীক (র) মহানবী (সা)-এর সম্মান বিষয়ে এমনটি বলেছেন–*হে হিজায অভিমুখী যাত্রী! আমি তোমার জন্য উৎসর্গ হই, তুমি দিবারাত্রি চলতে থাকবে। যখন তুমি বুযুর্গী-নৈকট্য অন্বেষণে রাত জাগরণ করবে; তখন তন্দ্রাও যেন না আসে তোমার ধারে*

তুমি সে-স্থানে যাবে যেখানে প্রচুর 'নূর' চমকাতে থাকে; আর যেখানকার মাটি সুগন্ধি ছড়াতে থাকে

তুমি ওইসব স্থান ও ঝর্ণার পাশে অবস্থান নেবে; যা 'কুবা' উপাত্যকার নিকট, 'উম্মুল-কুরা'র সবুজ-শ্যামল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত

তারপর প্রিয়নবীর নিদর্শনের দিকে এগুবে; তাঁর যিয়ারত শেষে দু'গাল মাটিতে রেখে দেবে

আর যখন তুমি ওহী নাযিলের স্থান দেখতে পাবে; যা সারা পৃথিবীতে জ্যোতি আর জ্যোতি ছড়িয়েছে

মনে রেখো! তুমি তাঁর অনুরূপ কাউকে দেখতে পাওনি; বিগত দিনেও নয়, নয় ভবিষ্যতেও।

উদাহরণ-১৩

কোন কোন বড় ওলী-শায়খ বাহনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, পায়ে হেঁটে নিজ বাড়ি থেকে মদীনা শরীফ যিয়ারতে, সফরে বের হতেন। জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাবে বলতেন: 'পলায়নপর দাস নিজ মনিবের দ্বারে বাহনে আরোহণ করে হাজির হয় না। যদি শক্তি থাকতো, তাহলে তো আমি বরং মাথা নিচু করে, (মাথার দ্বারা হেঁটে) তাঁর দরবারে হাজির হতাম!' (আশ্‌শিফা)।

উদাহরণ-১৪

হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন কারও চিন্তায় এল, তাঁকে মহানবী (সা)-এর রওযা শরীফের কাছে দাফন করা হবে। বিষয়টি তাঁর কান পর্যন্ত গড়ালে, তিনি তা প্রত্যাখ্যানপূর্বক বললেন: 'মহানবী (সা)-এর রওযার পাশে দাফন হওয়া আমার পক্ষে বে-আদবীর নামান্তর হবে। আমার সময়টা কি? কোন্ সময়-স্তরে আমার অবস্থান যে, তাঁর কবর শরীফের কাছে আমার কবর হবে?'

উদাহরণ-১৫

জনৈক ব্যক্তি হযরত কাসেম নানুতুবী (র)-কে সবুজ রঙ্গের অত্যন্ত সুন্দর একটি জুতো উপহার দিলেন। তিনি সুন্নাত হিসাবে 'উপহার-হাদিয়া' গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু তা ব্যবহার করলেন না। কেউ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে, তার জবাবে বললেন: 'কাসেম এর জন্য এমনটি অশোভনীয় যে, 'রওযা শরীফ'এর রঙও সবুজ আর আমার জুতোর রঙও হবে সবুজ! সবুজ রঙ্গের জুতো পরিধান আমার মতে বে-আদবীর নামান্তর।'

উদাহরণ-১৬

একজন লোক হযরত গাঙ্গুহী (র)-কে একটি কাপড় হাদিয়া দানকালীন বলল, হুজুর এটা আমি মদীনা শরীফ থেকে এনেছি। তিনি কাপড়টিকে চুমু খেলেন এবং তা চোখে মুছে নিলেন। একজন ছাত্র বললেন, 'হযরত! এটা তো ভিন্ দেশী কাপড়; মদীনায় তো এটা তৈরি হয়নি'। তিনি বললেন, হোক তা যে-কোন দেশেরই তৈরি; মদীনা শরীফের, মাহবূব (সা)-এর দেশের হাওয়া তো এর গায়ে স্পর্শ করেছে। নবীপ্রেম ও নবী (সা)-এর প্রতি আদব-সম্মান প্রদর্শনের কত উত্তম উদাহরণ! মহানবী (সা)-এর বাহ্যিক সুন্নাত-আদর্শ পালনের পাশাপাশি তাঁর প্রতি বাহ্যিক ও আন্তরিক আদব-শিষ্টাচার প্রদর্শনেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।♦

মুজিববর্ষের আলোকে বিজয় দিবসের তাৎপর্য

মিলন সব্যসাচী

২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি থেকে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু। সময়ের ব্যবধানে এরই মাঝে সমাগত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস ২০২০। মুজিববর্ষে এই বিজয় দিবসটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু। জন্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেন দুটি ভিন্ন দেহে অভিন্ন একপ্রাণ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু লিখতে বসলেই দৃষ্টির সীমানা ছুঁয়ে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অনুষঙ্গে কিছু লিখলেই অমলিন ইতিহাস বঙ্গবন্ধু অনয়াসে জড়িয়ে যায়। অতএব, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই ডিসেম্বর মাসেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ ও বিজয় এক এবং অভিন্ন সূত্রে গাঁথা এবং সার্থক সমার্থক। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আহ্বানে মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রোষ্টা বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের জন্মদাতা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টির জন্যই (তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর) বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ কথাটি দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। পাহাড় সমান বঞ্চিতব্যথা বুকে ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রতিশোধে বঙ্গবন্ধুই রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুক্তির মশাল জেলে সভা-সমাবেশে মিছিল মিটিংয়ের অগ্রভাগে তিনিই অকুতভয় সৈনিকের মতো সক্রিয় থাকতেন। তাঁর অসীম আকাশের মতো প্রশস্ত বুক জুড়ে ছিল সীমাহীন সাহস। পাকিস্তানের মিনওয়ালী কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে রেখে শাসকগোষ্ঠী তাঁর জন্য ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। এমন কী কবর খুঁড়ে রেখেছিল। নিখাদ স্বদেশ প্রেমে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনড় অটুট। তাই তিনি অকাল মৃত্যু ভয়ে আৎকে ওঠেননি। পরোয়া করেনি-ঘৃণ্য ঘাতক চক্রের হুমকী ধুমকী। অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বাঙালি জাতিকে সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে প্রস্তুত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ মেধা, মনন, সাহসিকতা ও বীরত্বগাঁথার জন্যই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কেউ কী ভেবেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিন বাঙালি জাতির পিতা হবেন। হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন। এ দেশের স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ইতিহাসে শেখ মুজিব অমর অক্ষয়। কুচক্রীরা যতই ইতিহাস বিকৃতি কারার ঘৃণ্য প্রয়াসে মগ্ন থাকুক না কেন, বাঙালির হৃদয়ে থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার সাধ্য আছে কার? তাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিতার ভাষায় বলতে বড় সাধ হয়। 'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা/ গৌরী যমুনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা/ রক্তগঙ্গা বহমান/ নাই নাই ভয় হবে হবে জয়/ জয় মুজিবুর রহমান।' প্রকৃত অর্থেই মুজিবের জয় হয়েছে। কবিতার মতো কবির কল্পনার মতো শাশ্বত, সত্য, সুন্দর। এ জয়ের ব্যাপকব্যাপ্তী যেন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এমনকি বিশ্বব্যাপী। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি এখন বিশ্বের বিস্ময়। শত বছর পরেও বাঙালি ও বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুকে পরম শ্রদ্ধা ভারে স্মরণ এবং বরণ করছেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর কাছে আরও প্রভুতভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বিজয়, বাংলাদেশ মূলত একইসূত্রে গাঁথা।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই ঘোষণাটি দিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় স্বাধীনভাবে আরও বেশি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পেয়েছেন। যার ফলে ৬ দফা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ২৩ বছর রাজনৈতিক জীবনে ১৩ বছর কারাবরণ করতে হয়েছে। কারাগারে বন্দি থেকেও তিনি আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হন অতঃপর কারাগারের ভেতর থেকে আন্দোলনের পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর মনের মাঝে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, চিন্তা- চেতনা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আলোকিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, এসব শব্দ উচ্চারণের প্রতি তৎকালীন সরকারের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিশ্বমানবতার জননী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাঙালি জাতিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুখে উচ্চারণ ও মনে ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই এ জাতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। শেখ হাসিনার সাহসী রাষ্ট্রপরিচালনা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শেখ হাসিনা। তার শ্রেষ্ঠতম পরিচয় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা। কিউবার রাষ্ট্রপতি বিশ্বনন্দিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন 'আমি হিমালয় দেখিনি , বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি।' অর্থাৎ সর্বোচ্চ হিমালয়ের উচ্চ শেখরের সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর তুলনা করেছেন। বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল। তার দু'চোখের কোটরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথরিয়া পর্যন্ত এমন কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল নেই যেখানে বঙ্গবন্ধুর পদস্পর্শ পড়েনি। আটষট্টি হাজার গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের হৃদয়ের প্রাণপ্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু। যার মতো সংগ্রামী, ত্যাগী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতা সমগ্র বিশ্বেই বিরল। বিশ্বের বহু নেতার মানবিক গুনাবলি, সাহসী বৈশিষ্ট্যকে ছাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে উন্নত শিরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে শেখ হাসিনার নিরলস সাধনা ও দূরদর্শীতার কারণে। ২০৪১ সালের মধ্যে এ দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। মুজিববর্ষের এই বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব মনে পড়ে। ১৫ আগস্ট রাতে কী নির্মমভাবে তার শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের ঘাতকচক্ররা হত্যা করেছে। দীর্ঘদিন পরে হলেও খুনিচক্রের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। অন্যান্য পলাতক আসামীদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকুক না কেনো বঙ্গবন্ধুর খুনিরা অবশেষে রক্ষা পাবে না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রাঙা এই বাংলাদেশের মাটিতে তাঁদের ফাঁসি কার্যকর হবেই। তাই বলেছিলাম যে মুজিববর্ষে আমাদের কাঙ্খিত বিজয়ের বিজয় দিবসের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০ সালে ৪৯ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করলো সারা বাংলাদেশ। মাত্র এক বছর পরেই ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। ইতোমধ্যেই অনেক কণ্টকিত পথ পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শক্তিশালী হাত ধরে বাংলাদেশ প্রতিক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন স্বল্পউন্নত দেশ হিসেবে সুপরিচিত। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল মূলত গণতন্ত্রহীনতা ও অবাধ দুর্নীতির ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র বারংবার হোঁচট খেয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কখনও সখনও স্বৈরশাসনের জাতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ মুখ থুবড়ে পড়েছে। অতঃপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার হারানো গণতন্ত্র ফিরে পেয়েছে।

এ বছর বিজয় দিবসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সামনে রেখে আজকে শুধুই সাফল্যের গৌরবগাঁথা নয়, আমাদের ব্যর্থতার দিকেও ফিরে তাকানো প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা যদি পালাক্রমে ব্যর্থতার বোঝা বহন করে মেরুদণ্ড কুব্জ

করে বসে থাকি তা হলে জাতি কোনো দিনও আমাদের ক্ষমা করবে না। সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি শেখ হাসিনা যতটা দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন, অন্য কারো পক্ষে তা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা এ বছর ৪৯তম বিজয় দিবস পালন করছি। অথচ আমরা এখনো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে পারিনি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা একদিন 'সোনার বাংলা' নির্মাণে সক্ষম হবো। তার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, সৎ ও সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন। বাঙালি জাতি ঐতিহ্যবাহী মহান জাতি। অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি কাঙ্খিত বিজয়, কাঙ্খিত বাংলাদেশ। বাঙালি জাতি এখন বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। গোখলে বলেছিলেন- 'Wath Bengla thinks today, India thinks tomorrow' বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নেতাজীর বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার কথা কে না জানে। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে নেতৃত্ব ও সাহসিকতা জন্মাতে শুরু করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধুকে উপদেশ দিয়েছিলেন- যে কোনো কাজে Sincerty of Purpose and honesty of purpose মেনে চলবে।' বঙ্গবন্ধু আজীবন এই উপদেশ মেনে চলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও সেই উপদেশ মেনে কাজ করে যাচ্ছেন। মুজিববর্ষে এই বিজয় দিবসে আমরা শপথ নিয়ে যদি স্বদেশ প্রেমে ব্রতী হই। তাহলেই আমাদের মাঝে গড়ে উঠবে ভ্রাতিত্ববোধ, সামাজিকতা, স্বদেশপ্রেম, সভ্যতা, মানবতা ইত্যাদি। মুজিববর্ষের এই বিজয় দিবসকে আরও বেশি স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের আরও বিণয়ী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। মুজিববর্ষে অধিকতর সৃষ্টিশীলতা আশাবাদী, মুজিব আমাদের জাতির পিতা, মুজিব আমাদের আদর্শের প্রতীক, অন্তহীন প্রেরণায় প্রতীক সাহস ও শক্তির প্রতীক, উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রতীক, দেশ প্রেমের প্রতীক, বিশ্বমানবতার প্রতীক। শয়নে স্বপনে স্মরণে বরণে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের প্রাণ। ইতিহাসের জঠরে জঠরে কত নাম না জানা আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল অনেক আন্দোলন অঙ্কুরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে কোনো কোনো আন্দোলন জাতিকে উজ্জীবীত করেছে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

সিপাহী বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, ফকির মজনু শাহর রুটি বিদ্রোহ, মীর নাসির আলী (তিতুমীর) এর বাঁশেরকেল্লা, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ক্ষুদিরামসহ হাজারও মানুষের আত্মত্যাগ, ইলামিত্রের খাপড়া ওয়ার্ড বিদ্রোহ, জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডসহ তেভাগা অন্দোলনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলন আমাদের চূড়ান্ত মুক্তি বা বিজয়ের দিকনির্দেশনা

দিতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছে। ১৯৪৭ সালে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান এবং ভারত নামের যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটনার সুত্রপাত করেছিল, কালের পরিক্রমায় সেই দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কেননা ধর্মকে পুঁজি করে কোনো জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বিশ্ব নন্দিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খণ্ড উপহার দিয়ে যে অসীম সাহসিকতার প্রমাণ করে। বিশ্ব মানচিত্র বদলে দেওয়ার যে ধীষ্টতা দেখিয়েছেন। তা সত্যি প্রসংশার দাবিদার। বাঙালিদের জন্য একটি সতন্ত্র আবাস ভূমি প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিলে তিলে সংগ্রামকে পরিণতির দিকে নিয়ে এসেছিলেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছেন বিশ্বে বাঙালি এক অনন্য বীরের জাতি।

স্বাধীনতার অব্যাবহিত পূর্বে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো। কিন্তু এখন ঠিক তার বিপরীত প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে ২১.৮ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় উন্নয়ন এখন বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত ও নন্দিত ২০২০-২০২১ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে SDG'র গোলসমূহ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের একটি উন্নত রাষ্ট্র। এগুলো এখনও শুধু স্বপ্ন নয় চিরন্তন সত্য এবং বাস্তব। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কালজয়ী কীর্তির মাঝে ও স্বপ্নীল প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধু সতত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। শেখ হাসিনার সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই পদ্মাসেতু এখন বাস্তবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। জয় হোক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার।♦

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং জাতির জনকের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই ভৌগলিকভাবে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের গভীর চেতনাকে প্রকাশ করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সেই চেতনাকে আর শক্তিশালী করেছে। যদিও দ্বিজাতিতত্ত্বের মারপ্যাঁচ এবং তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলার এই অংশ আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত চেতনাকে পাশ কাটিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্ববাংলার জনগণ তা সহজে মেনে নিতে পারেনি। পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য ও বিমাতাসূলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ

পাকিস্তানের মেরুদণ্ড দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন।

পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য এবং দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামীলীগ। তিনি জীবনের শুরু থেকে এদেশের জনগণের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জেল জুলুমকে উপেক্ষা করে জাতিকে মুক্তির লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর ক্যারিজম্যাটিক্ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই চার মহান নেতা বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্বরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন জাতীয় দুর্দিনে বাঙালিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আর বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন স্বদেশ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সনে ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন যা ক্রমান্বয়ে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে জন্ম দেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এই ধাত্রীরূপী সংগ্রামের সংগঠক ও পরিচালনাকারীর কৃতিত্ব কেবলই বঙ্গবন্ধুর। তাই তিনি বাঙালি জাতির জনক। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে ১৭ দিনের সশস্ত্র সংগ্রামে পাকিস্তান পরাজিত হলে অসম্মানজনক তাসখন্দ যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পরাজয়, অপমান খুলে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর উত্থানের পথ। ১৬ পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব, দলমনা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও কয়েকজন সরকারি আমলার পরামর্শক্রমে তাঁর ছয় দফা দাবিনামা প্রস্তুত করলেন, যার লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। এই কর্মসূচি অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। কারণ পশ্চিমের অর্থনৈতিক নিপীড়নের চাপে পিষ্ট ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলেছিল প্রতিবছর এবং সেই সঙ্গে সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সংস্কারের দাবি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল প্রতিদিন। এতে কেন্দীয় সরকার মনে মনে প্রমাদ গুণল।

১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং এই ছয় দফাকে আখ্যায়িত করেন 'আমাদের (বাঙালিদের) মুক্তি সনদ' রূপে। দফাগুলো হলো : ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন এবং সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন; ২. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত অপর সকল বিষয় ফেডারেটিং ইউনিট বা প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৩. দুই রাষ্ট্রের জন্য পৃথক মুদ্রা চালু করা অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪. করারোপের সকল ক্ষমতা ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান; ৬. রাষ্ট্রসমূহকে নিজের নিরাপত্তার জন্য মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা। সংক্ষেপে এ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রতি তাঁর এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ছয়-দফা কর্মসূচীর অর্থ ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা। সকল রাজনৈতিক দলের রক্ষণশীল সদস্যরা এ কর্মসূচীকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও এটা তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র, যুবক এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নূতন জাগরণের সৃষ্টি করে।

মুজিব কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচীর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পর আইয়ুব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেখ মুজিব এবং আরও চৌত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়।

সরকারিভাবে এ মামলাটির নাম দেয়া হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। মামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান বিমান এবং নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার এবং কর্মচারী। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন উর্ধ্বতন বাঙালি বেসামরিক কর্মকর্তা। মুজিব ইতোমধ্যে কারারুদ্ধ থাকায় তাঁকে এক নম্বর আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়। এ মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি অন্যান্য আসামীর যোগসাজশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অভিযোগ মতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আসামী ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করার গোপন পরিকল্পনা করছিলেন। পাল্টা আঘাত হানার এ চালটি অবশ্য বুমেরাং হয়েছিল। ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটির বিচার চলছিল যেটা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আবেগ অনুভূতিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় মুজিবের জনমোহিনী রূপ আরোও বিকশিত হয় এবং সমগ্র জাতি তাদের নেতার বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের দ্বারা সংগঠিত গণ আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে আইয়ুব সরকার দেশে আসন্ন একটি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টায় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক জাস্টিস রহমান বাংলা একাডেমীর পাশে STATE GUEST HOUSE-র লাল দালানের পেছনের দরজা থেকে পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। *১৮* শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করেন।

শেখ মুজিবের মুক্তির পরবর্তী দিন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবের সম্মানে গণসম্বর্ধনার আয়োজন করে। এ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের সরকারকে বাধ্য করার ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকর রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি বলে প্রমাণিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'বঙ্গবন্ধু' কোন নাম নয়, অভিধা। অভিধা এমনিতে পাওয়া যায় না; বাবা-মা কিংবা ন্যায়ালয়ের কাছ থেকেও নয়। এটি অর্জিত। অর্জিত হয় মালিন্যময় খিন্ন দৈনিক জীবনেরই ঐশ্বর্যময় আলোকসম্পাতের মাধ্যমে। অর্জিত হয় অভিধা আর হারিয়ে যায় নাম। মহাত্মা গান্ধীর পেছনে লুকিয়ে পড়ে তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আর

নেতাজী বললেই বুঝতে পারি সুভাষ চন্দ্র বসুকে। চিত্তরঞ্জন দাস অন্ধকারে তলিয়ে যান দেশবন্ধুর আড়ালে। বিদ্যাসাগরের নাম যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একথাও ভুলে যাই। মনে রাখি শেরে-বাংলাকে, আবুল কাশেম ফজলুল হককে মনে রাখবার প্রয়োজনই পড়ে না আমাদের। এভাবেই অভিধান আলোকিত ঝর্ণাধারার সরব প্রপাতে হারিয়ে যায় নাম, থাকে শুধু অভিধা, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একটি মহাকাব্যের মহাকবি, মহানায়ক। আর 'এই মহাকাব্য জাতীয়তাবাদের। আরো নির্দিষ্টার্থে এ হচ্ছে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ও পরিণতিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।'

নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে আপন ছায়ার বিস্তার ঘটিয়েছেন বঙ্গবাসীর আর্তপীড়িত বুভুক্ষু হৃদয়ে। প্রকৃত বন্ধুর আসন লাভ করে ফেলেছেন। বন্ধু আমরা কাকে বলি? কাব্য ভাষায় বলতে গেলে ঃ

বন্ধুতো সেই জন আত্মার শীতল পাটিতে যার স্বস্তিময় শয়ান
মননের পললে যে জীবনের বীজ বোনে, ডাক দেয় ফজরের ভোরে
সুখে ও দুঃখে থাকে পাশাপাশি, জীবনের মর্মমূলে নাড়া দেয় জোরে
জীবনে জীবন যোগ করে আর মুক্তমন্ত্র বিবেকের করে যে বয়ান।

মুজিবের মধ্যে তারা এমন একজন ত্যাগী নেতার প্রতিফলন দেখতে পান যিনি ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলের প্রায় বারো বছর জেলে কাটিয়েছেন। বারো বছর জেলে এবং দশ বছর কড়া নজরদারীতে থাকার কারণে শেখ মুজিবের কাছে পাকিস্তানকে নিজের স্বাধীন বাসভূমির পরিবর্তে এবং কারাগার বলেই মনে হতো।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের ১৬৭ টি আসনে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসন সহ) জয়লাভ করে।

আপামর জনগণ তাঁকে ছয়দফা মতবাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট প্রদান করে। ছয়দফা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রমনা রেসকোর্সে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং শপথ নেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তারা কখনও ছয়দফা থেকে বিচ্যুত হবেন না।

১ মার্চ তারিখে ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা ও ২৫ মার্চ, মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলাপ আলোচনার হঠাৎ যবনিকা পতনের ও রাত্রির অন্ধকারে গোপনে ইয়াহিয়া ভুট্টোর ঢাকা ত্যাগের মধ্যবর্তী কাল ছিল দ্রুতগতি ঘটনাপুঞ্জের এক রুদ্ধশ্বাস কাল। অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানকে ফেলে রেখে ওরা দেশটিকে এক নিষ্ঠুর সামরিক আগ্রাসনের মুখে ঠেলে দিলেন ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যরাতের তথাকথিত অপারেশন সার্চলাইটে। কালুর ঘাট রেডিও স্টেশন থেকে রেডিও পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ বেতারে শেখ মুজিবের নামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হানাদার পাকিস্তানির দ্বারা আক্রান্ত ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত এবং সমগ্র বিশ্বের সমর্থন কামনাকারী বলে ঘোষণা করলেন জিয়াউর রহমান। জাতি জড়িয়ে পড়ল এক যুদ্ধে। অসীম নিষ্ঠায় ও যোগ্যতায় যুদ্ধ পরিচালনা করলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা তাজউদ্দিন আহমদ, এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করলাম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য ও সম্পূর্ণ সমর্থনে ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে সূচিত হল আমাদের বিজয়। স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হলো ২৬ শে মার্চ, সেদিন চট্টগ্রাম থেকে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা ও যুদ্ধের ঘোষণা।

স্বাধীনতা হল জন্মগত অধিকার। এটা অমুসলমান-মুসলমান সবারই অধিকার। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রুশো তার 'দি সোস্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে লেখেন, 'ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি, এন্ড এভরি হোয়ার হি ইজ ইন আয়রনস' (মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খলবদ্ধ)।

বাংলাদেশ স্বাধীন, বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা ও সর্বাধিনায়ক
৩রা মার্চ পল্টনের ঘোষণা

১. এই সভা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালি ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জগণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধে আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

২. এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বীর বাঙালি ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালি ভাইদেরকে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত প্রদানের আহ্বান জানাইতেছে।

৩. এই সভা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪. এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫. এই সভা দলমত নির্বেশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।

১৬ ডিসেম্বর এবং বাংলার সাধারণ মানুষ

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এদিন বাংলার মানুষ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এটি বাংলার মানুষ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এদিনে বাঙালিরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে এটি তাৎক্ষণিক বাংলার সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নাগরিক সেদিন বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। সেদিন চুক্তি স্বাক্ষরের শেষ বিকেলের মহেন্দ্রক্ষণে সারা বাংলার মানুষ আনন্দের জোয়ারে ভাসতে লাগলেন। বাংলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে স্বাধীনতার লাল সূর্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দে আত্মহারা আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা জয় বাংলা ধ্বনি দিতে থাকে এবং মিষ্টি বিতরণ শুরু করে। প্রত্যেক বাড়িতে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। মসজিদ মন্দিরসহ বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। গৃহত্যাগী এবং বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিরা বাড়ি ফিরতে আরম্ভ করে।

মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ক্যাম্প ও আস্তানায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। এত বড় অজর্ন যাতে বৃথা না যায় সেজন্য মুক্তি যোদ্ধারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। দেশের বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণি পেশার মানুষ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতার আনন্দকে উপভোগ করতে থাকে।

এদিন ঢাকা শহরের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ। ভিন্ন ঢাকার সোহরাওয়াদী উদ্যানকে ঘিরে সারা ঢাকা শহরের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এ উদ্যানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডারের আত্মসমর্পণের খবর ছড়িয়ে পড়লে শহরের সব মানুষ সেখানে জড়ো হতে থাকে। ঢাকা শহরের সব শ্রেণি পেশার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং

স্বাধীনতার জয়োল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। সময় যত গড়াতে থাকে জনগণের উৎকণ্ঠা ততই বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে জাতি এগিয়ে যায় নতুন দিনের দিকে। অবশেষে বিকাল চারটা একত্রিশ মিনিটে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর হলে সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ছিল মুজিব সরকারের শাসনামল। ভারত থেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয় অর্জনের ছয় দিন পরে ঢাকায় আগমন করে। তারও প্রায় ২২ দিন পরে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিপরিষদের ব্যাপক রদবদল করেন।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া এবং ১৩ জানুয়ারি ঘানা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৫ জানুয়ারি এক সরকারি আদেশে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করা হয় এবং একই তারিখে রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নির্দেশ জারি করা হয়। তারা যেন ১০ দিনের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করেন। ২৫ জানুয়ারি চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের বেতনের শতকরা দশ শতাংশ সরকারি তহবিলে দান করার জন্য সরকার আহবান জানায়।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ৮টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলে উদার হস্তে দান করার জন্য দেশের বিত্তবান ব্যক্তিসহ দেশি বিদেশি সংস্থার প্রতি প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আহবান জানান।

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত ইন্দিরা-মুজিব বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন এবং আলোচনার সমাপ্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয় যে ১৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭২ সালের মধ্যে সকল ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব অস্বীকার করায় ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এক জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ১৯৭২ সালের ১ মার্চ ২৫ ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালর ১ মার্চ ৫ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মস্কো গমন করেন এবং সেখানে সরকার প্রধান ব্রেজনেভের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭২ সালের ৬মার্চ দেশে ফিরে তিনি তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে পুনর্বাসিত করে বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) গঠন করার নির্দেশ দেন।

১৯৭২ সালের ৭মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ জারির মাধ্যমে জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের ৪ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত শ্রীলংকা, সোমালিয়া, গ্রিস, সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালের ১৪ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বাংলাদেশ থেকে তাদের সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়। ১৭ মার্চ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন।

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ শ্রীমতি গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ব স্ব রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর মেয়াদি এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিই 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি' নামে পরিচিত।

১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্য পদ বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি করা হয়।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তারিখে মুজিব সরকার কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার কথা ঘোষণা করেন।

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকতি দেয়। ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার তিনটি পৃথক প্রতিরক্ষা বাহিনী পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১০ মে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ১৮ মে মুজিব সরকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ২৪ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনা হয়। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে।

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক 'জুলি ও কুরি' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের পদ লাভ করে। ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে। ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকারী হয়। নতুন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮ ডিসেম্বর তিনি সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করেন এবং ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯৭৩ সালের ৭মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮২ টি আসন অর্জনসহ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৭৩ সালের ৪ এপ্রিল সরকার বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি আদেশ জারি করে। ৭ এপ্রিল প্রথম জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৩ সালের মে মাসে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে এশীয় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জুলি ও কুরি' পদক প্রদান করা হয়।

১৯৭৩ সালের ৮জুন ড. কুরত-ই-খুদা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই সরকার সরককারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করে।

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই জাতীয় সংসদ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইন পাশ করে।

১৯৭৩ সালের ১৬ জুলাই গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে দিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৩ সালের ২৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগোশ্লাভিয়া সফর এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মিলনে যোগদানের জন্য ১৮ দিনের সফরে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মিলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলজিরিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এই সম্মিলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো, তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারে, কম্বোডিয়ার প্রেসিডেন্ট নরোদম সিহানুক, সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল এবং মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত বৈঠক হয়।

১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় সংশোধনী বিল গৃহিত হয়।

১৯৭৩ সালের ১৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) এ তিনটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ঐক্য জোট গঠিত হয়।

১৯৭৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর সারাদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন শুরু হয় এবং ৩ জানুয়ারি ১৯৭৪ শেষ হয়।

১৯৭৪ সালের ২৯ জানুয়ারি যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা আসেন। ৩০ জানুয়ারি টিটো-মুজিব একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ যুগোশ্লাভিয়া যুক্ত ইশতাহার ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ সংসদের সমাপনী দিনে বিশেষ ক্ষমতা বিলটি বিপুল ভোটে পাশ হয়।

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৮মার্চ আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন ঢাকায় আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে তার হৃদ্যতার পূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১১ মার্চ কুমিল্লায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমি উদ্বোধন করেন।

১৯৭৪ সালের ৪ মে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বৈঠকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে দমন করার জন্য এ বৈঠকে সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

১৯৭৪ সালের ১২ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফরে যান এবং ১৩ মে সেখানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। ১৪ মে ভারত বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। যুক্ত ঘোষণায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৭৪ সালের ১৫ জুন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আগমন করেন এবং ১৮ জুন সংসদের এক বিশেষ অধিবেশনে তিনি ভাষণ দান করেন।

১৯৭৪ সালের ২৭ জুন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো এক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আগমন করলে বিমানবন্দরে তাকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২৮ জুন দুই দেশের সরকার প্রধান ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালের ২৯ জুন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বঙ্গভবন অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন ৩০ জুন ভাসানী ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিলের আহবান জানান। ২৯ জুন রাতে মাওলানা ভাসানীকে তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিজ বাড়ি সন্তোষে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়।

১৯৭৪ সালের ৭ জুলাই মুজিবের মন্ত্রিসভা থেকে ৬ জন মন্ত্রী এবং ৩ জন প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করা হয়। ৯ জুলাই এক সরকারি ঘোষণায় চোরাচালান রোধকল্পে সীমান্তে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। ১৮ জুলাই ঢাকার আইজিকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। ২২ জুলাই জাতীয় সংসদে দুর্নীতি ও সমাজ বিরোধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান সংবলিত আইন পাস করা হয়।

১৯৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বন্যাদুর্গত বাংলাদেশকে আলজিরিয়া ১০ লাখ ডলার সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা করেন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এর সাথে এক স্বল্প সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোনো প্রকার সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেননি। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেননি।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশকে ৫ কোটি ডলার ঋণদানের কথা ঘোষণা করে। একই দিনে কাতার ১৫ লাখ ডলার এবং ১৩ অক্টোবর তারিখে জাপান ৮০ লাখ ডলার সাহায্যদানের প্রশ্রিুতি দান করে।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার দেশের দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দেশের সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়নে পর্যাপ্ত লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করে। ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ৩৭ দিন নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিদেশে অবস্থানের পর দেশে ফিরে আসেন।

নভেম্বর মাসেই সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং এ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে এক ভাষণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের তিনটি মহাশত্রুর কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো- (১) মুদ্রাস্ফীতি, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা চোরাচালানি, মুনাফাখোর, মজুতদার ও ঘুষখোর।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর, দেশের সার্বিক সংকট ও বিপর্যয়মুখী পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সাথে পরামর্শক্রমে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

১৯৭৫ সালের ৬ জানুয়ারি অনির্দিষ্টকালের জন্য সভাসমাবেশ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওপেক এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তার ঘোষিত সিস্টেমের সাথে খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ, জেনারেল (অব) এম. এ. জি. ওসমানী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয় সংসদে ৪র্থ সংশোধন বিল উত্থাপন করেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়। ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা মন্ত্রিসভা শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা আইন বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন করা হয়।

১৯৭৫ সালের ৫ মার্চ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে ১২ কোটি টাকা ঋণ দানের কথা ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। ২৮ মার্চ বাংলাদেশ ও জাপানের

মধ্যে ৩০ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৯ মার্চ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বাংলাদেশের জন্য সাড়ে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৯৭৫ সালে ১৬ এপ্রিল সরকার একটি অদ্যাদেশ জারি করেন। এ দিন ভারতের ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে ঢাকায় বাংলাদেশ ভারত মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক আরম্ভ হয়। ২৫ এপ্রিল সরকার একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করে।

১৯৭৫ সালের ২২ মে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। ৪ জুন সরকার দেশে শিল্পায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সংস্থা আদেশ সংশোধন করে। বিশ্বব্যাংক ৫ জুন বাংলাদেশকে ১২০ কোটি ডলার সাহায্য প্রদানের জন্য কনসোর্টিয়াম দেশগুলোর প্রতি আহবান জানায়। ১৯৭৫ সালের ২২ জুন বিদ্যমান মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়। এ দিন সরকার দেশের ৬০টি জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা করে।

১৯৭৫ সালের ৯ জুলাই সংসদে জেলা প্রশাসন আইন নামে একটি আইন গৃহীত হয়। এ আইনে প্রত্যেক জেলায় ১ জন করে গভর্নর নিয়োগের বিধান ঘোষণা করা হয়। গভর্নর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তার সন্তোষ অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকবেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সমবায় পরিকল্পনা। ১৯৭৫ সালে মার্চ মাসে সরকার ঘোষণা করে যে, পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে ৬০-১০০টি গ্রামে সমবায় গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। উপরিউক্ত পদক্ষেপ কার্যকর করার পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র সাড়ে দিন বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বিধ্বস্ত অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থায় ও ধ্বংসপ্রায় অর্থনৈতিক কাঠামোতে এত অল্প সময়েও আওয়ামী লীগ সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।♦

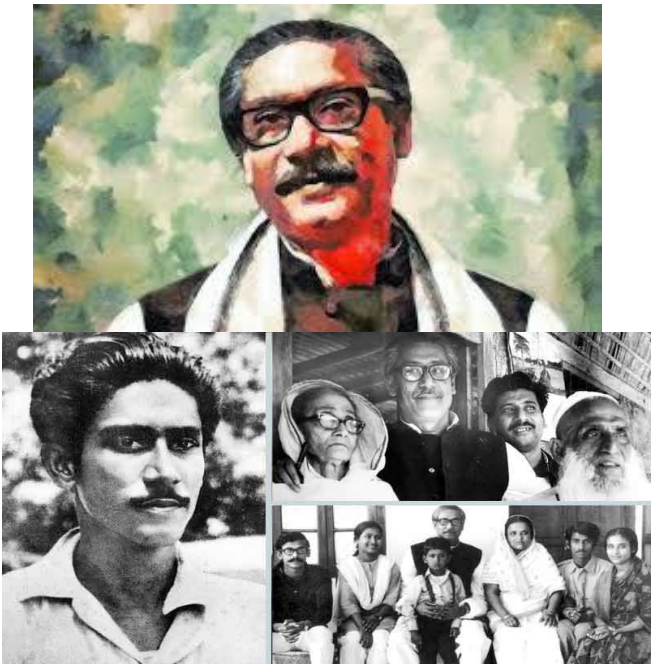

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি–
শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

মূলঃ প্রভিন নায়ের

অনুবাদ : কাজী আখতারউদ্দিন

মালয়েশিয়া কেন্দ্রিক একটি লিডারশিপ ডেভেলাপমেন্ট সংগঠন 'Leaderonomics' থেকে ২০১৮'র ৮ মে What lessons can we learn from Sheikh Mujibur Rahman?–শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি? শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর লেখক সাংবাদিক প্রভিন নায়ার। প্রভিন নায়ার মালয়েশিয়ার পেট্রোনায় একজন ওয়েলস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। ক্যুলিনে বসবাসরত প্রভিন ইউনিভার্সিটি পেট্রোনায় পড়াশুনা করেছেন। তিনি Leaderonomics-এ একজন ডিজিটাল লার্নিং পার্টনার হিসেবে জুন ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এখানে প্রতিবেদনটির অনুবাদ তুলে ধরা হল।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসী তাঁকে ভালোবেসে বঙ্গবন্ধু নামে ডাকতেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী একজন ব্যক্তিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি বিষফোঁড়া ছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন থেকে বাঙালিদের বন্ধন-মুক্তির জন্য যারা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি বা মধ্যমণি।

সে সময় পাকিস্তানে বাঙালিদের অধিকার খর্ব হতে থাকায় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি বিরাজ করায়, শেখ মুজিবুর রহমান প্রবল আবেগময় একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়।

শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মতো মানুষকে আকর্ষণ করতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তাঁর আচরণ এবং কূটনীতির ব্যাপারে অনেকসময় ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তা সত্ত্বেও প্রায় সকলেই একমত হন যে, তিনিই হচ্ছেন নতুন বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি এবং একটি সংকটময়কালে বাংলাদেশকে অত্যন্ত গুরুতর ও কঠিন একটি অবস্থা থেকে টেনে তোলার জন্য যে ধৈর্য তিনি দেখিয়েছেন, সেজন্য অবশ্যই তাঁকে প্রশংসা করা উচিত।

বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন থেকে নেতৃত্বের বিষয়ে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা নিম্নরূপ।

কূটনীতি

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া শেখ মুজিব থামিয়ে রেখেছিলেন। কেননা তিনি ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, এতে তাঁর দেশের মানুষের উপর কী ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসতে পারে। এই অঞ্চলের মানুষের মনে যে বিক্ষোভ বা অশান্তি দানা বেঁধে উঠেছিল, অধিকাংশ সময় তিনি তার একটা কূটনৈতিক সমাধান চাচ্ছিলেন।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লাহোরের জাতীয় কনভেনশনে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেছিলেন। সেই প্রস্তাবে পাকিস্তানের দুটি প্রদেশের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তার একটি সেতুবন্ধন এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্বশাসনের দাবি তুলে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি সেই প্রস্তাবের নিন্দা জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ তারা শংকিত ছিল যে এই প্রস্তাব পাকিস্তানের বিভক্তিতে উস্কানি দেবে।

পরবর্তীতে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু নবনির্বাচিত নেতা ও নতুন

প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবুর রহমানকে শপথ পাঠ করানোর জন্য জাতীয় পরিষদ ৩ মার্চ, ১৯৭১ অধিবেশন আহ্বান করতে ব্যর্থ হয়। কারণ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা একটি দলের কেন্দ্রে শাসক দল হওয়ার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।

প্রভিন নায়ের

প্রবল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেখ মুজিব তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবির ব্যাপারে একটি মীমাংসায় আসার জন্য তাঁর নিন্দুক ও কুৎসাকারীদের সাথে বেশ কয়েকবার সংলাপে বসেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শেখ মুজিব তাঁর পররাষ্ট্র নীতিতে কূটনীতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্গানাইজেশন অব ইসলামি

কনফারেন্স (OIC) এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) সদস্য হওয়া। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশকে একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে নেওয়া দরকার। বিশেষত ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই সময়ে যখন সমগ্র বিশ্বে দুই পরাশক্তি– সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য চলছিল।

শিক্ষণীয় বিষয় : নেতা হিসেবে আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা দরকার। কেননা খুব বেশি আগ্রাসী বা অপ্রতিরোধী হলে একটি কার্যকর সমাধান খুঁজতে গেলে বরং পাল্টা ফল হতে পারে।

দৃঢ় প্রত্যয়

শেখ মুজিবের নেতৃত্বের একটি প্রধান গুণ ছিল যে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে যা যা তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তা অর্জনে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রচারণা চালাবার সময় তিনি অবিরাম তাঁর ছয় দফা দাবির উপর জোর দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলা এই প্রদেশকে বিরাজমান কর্মতৎপরতাহীন অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ মানুষের সামনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্ত। সেই ভাষণে তিনি বললেন: 'তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস. . . যদি আমরা এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারি, তাহলে অন্তত আমরা ভাই ভাই হিসেবে জীবনযাপন করতে পারি।'

শেখ মুজিবের অটল দৃঢ়তা, বাংলার জনগণকে তাঁর পাশাপাশি থেকে লড়াই করার প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস যোগাল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (১৯৬৯-১৯৭৪) এবং তাঁর সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার প্রায়ই শেখ মুজিবের অবিরাম সংগ্রাম নিয়ে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতেন।

একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে হলেও, উভয়েই প্রায় মন্তব্য করতেন যে, প্রবল চাপের মুখেও শেখ মুজিব নতি স্বীকার করতে রাজি হননি এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকার উন্নীত করার ব্যাপারে তাঁর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে ১৯৭২ সালে নিক্সন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি জানাল। এতে ঘটনার একটি বিশাল মোড় ঘুরে গেল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭১ যুদ্ধের পরিণতিতে এদেশে জান-মালের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, সে ব্যাপারে নিরব থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন একটি যুক্ত পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয় : আলাপ-আলোচনার কৌশল হিসেবে দৃঢ়প্রত্যয়ী মনোভাব ধরে রাখা একজন নেতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন নেতা যখন কার্যকরভাবে তাঁর মতামত তুলে ধরেন, তখন দলের সদস্যদের আত্মমর্যাদা বেড়ে যায় এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা অর্জনে তা সহায়ক হয়।

সাহসিকতা

এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ, যেখানে জীবন রয়েছে শাসকদলের করুণায়, সেখানে প্রবল প্রতিকুলতা মোকাবেলা করতে হলে প্রচুর সাহস এবং দৃঢ়সংকল্প হওয়া দরকার।

বিভিন্ন সময়ে সব মিলিয়ে শেখ মুজিব প্রায় ১২ বছর কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছিলেন। ক্ষমাহীন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি ফাঁসিরও মুখোমুখি হয়েছিলেন, তারপর ১৯৭২ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এত নির্যাতন, এত দুঃখকষ্টের পরও তাঁর ভেতরের আগুন কখনও নিভে যায় নি, বরং যে লক্ষ্য অজর্নের জন্য তিনি পথে নেমেছিলেন তা অর্জনের জন্য তা আরো প্রজ্বলিত হল।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সিদ্ধান্তটি ছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেপ্তার করার অপারেশন সার্চলাইটের একটি অংশ। তবে গ্রেপ্তারের পূর্বমুহূর্তে তিনি জনগণকে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার আহ্বান জানিয়ে একটি টেলিগ্রাফ মেসেজ পাঠান:

'এটাই হয়তো আমার শেষ কথা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের সকল মানুষ, যে যেখানে আছেন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে আপনারা দখলদার সেনার প্রতিহত করুন। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি দখলদার সেনা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে।'

তাঁর অদম্য সাহস তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রতিরোধ যোদ্ধার মাঝে ছড়িয়ে পড়লো, যারা পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। তাদের মনে এই বার্তাটি অনুপ্রেরণা যোগাল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ হতাহত হয়েছিল এবং এক কোটির অধিক মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আর যুদ্ধের খরচও ছিল অসম্ভব রকম।

১৯৭২ সালে *টাইম ম্যাগাজিনের* একটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'গত মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পরিণামে বিশ্ব ব্যাংক থেকে একটি বিশেষ

পর্যবেক্ষক দল এখানে এসে পর্যবেক্ষণ করলেন যে, কয়েকটি শহর 'দেখে মনে হচ্ছিল যেন, একটি পারমাণবিক বোমা আক্রমণের পরবর্তী সকালের দৃশ্য।' তারপর থেকে ধ্বংসযজ্ঞ কেবল বেড়েই চললো। আনুমানিক ৬,০০০,০০০ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং প্রায় ১,৪০০,০০০ কৃষক পরিবার তাদের জমিতে কৃষিকাজ করার যন্ত্রপাতি এবং গরু-বাছুর হারিয়েছেন।'

এত বিশাল একটি ধাক্কার পরও শেখ মুজিব সকল বাধাবিপত্তি কাটিয়ে তোলার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং দেশের প্রতি ভালোবাসাই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠন করার জন্য জনগণের মনে সাহস সঞ্চার করলো।

আনুমানিক ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন করা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি এবং কুটিরশিল্পে রাষ্ট্রীয় পুঁজি খাটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শেখ মুজিব একটি জাতীয়করণ কর্মসূচী হাতে নিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয় : নেতৃত্বের ভূমিকা হচ্ছে প্রগতির অন্বেষণে সকল প্রতিবন্ধকতার যন্ত্রণা অতিক্রম করা। যন্ত্রণাকাতর ঐ সময়ে মুজিবের সাহসিকতা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সাহসিকতার ভিত্তির উপরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বাস

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশে ফেরার পথে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ শেখ মুজিব নিউ দিল্লি বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বিমান যাত্রাকে তিনি 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে একটি অভিযাত্রা' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে: '*এই নয় মাসে আমার দেশের জনগণ শতবছর অতিক্রম করেছে। যখন আমাকে আমার জনগণের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তারা কেঁদেছিল; যখন আমাকে কারাগারে বন্দি করা হয়, তখন তারা লড়াই করেছে; আর এখন যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা জয়ী হয়েছে।*'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিবিসির স্যার ডেভিড ফ্রস্টের সাথে সাক্ষাতকারে শেখ মুজিব বলেছিলেন: '*আমার দেশের মানুষ আমাকে ভালোবাসে, তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমার এবং আমার দলের উপর তাঁদের আস্থা রয়েছে; আর আমি জানি যতদিন আমি এখানে আছি, আমার জনগণ আমাকে সমর্থন করবে।*'

দেশবাসীর উপর শেখ মুজিবের প্রচণ্ড আস্থা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অনেক অবিচার অত্যাচার সহ্য করার পরও তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ঠিকই লড়াই করবে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনার অভিযানের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন সেই বিশ্বাসের যথার্থতা প্রতিপাদিত হয়েছিল।

কিছু ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে এখনও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। ২০০৪ সালে বিবিসির এক জরিপে তাঁকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে বিবেচিত করা হয়।

আগেকার পাকিস্তানি সরকার যাদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছিল, সেই কোটি কোটি জনগণকে তিনি আশা দিয়েছিলেন এবং আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তিনি অনুপস্থিত থাকলেও, তাঁর প্রভাব এখনও সেভাবেই বিরাজমান রয়েছে। কারও কারও মতে তাঁর মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলেও শেখ মুজিব তাঁর কীর্তির কারণে অবশ্যই যথাযথ প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার।

শিক্ষণীয় বিষয় : মহান নেতারা তাঁদের দলকে নিজের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেন এবং 'এক-মানুষের দল' এই গূঢ়ার্থ থেকে দূরে থাকেন। সংগঠনের মধ্যেকার আস্থার ভিত্তির উপরই নেতৃত্ব গড়ে উঠে। প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে একজন নেতাকে দলের সদস্যদেরকে আস্থায় নিতে হবে। নেতাকে দলের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মঞ্চ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর বিনিময়ে তারাও নেতার ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের কারণে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে প্রভূত অবদান রাখবেন।

শেষ পরিণতি

শেখ মুজিবের জীবনের শেষ দিনগুলো অত্যন্ত বিয়োগান্ত ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভোর রাতে আওয়ামি লিগ এবং সামরিক বাহিনীর কিছু পথভ্রষ্ট সদস্য তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই একটি ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে অনেক পিছিয়ে নেয় এবং বহু বছরের জন্য একটি রাজনৈতিক উন্মাদাশ্রমের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ফেলে দেয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে শেখ মুজিবের জীবনের এই শেষ পরিণতির পেছনের কয়েকটি কারণ ছিল:

১. ১৯৭৪ সালের দুর্বিসহ দুর্ভিক্ষ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার ব্যাপারে তাঁর সরকারের ব্যর্থতা। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে দেশের অর্থনীতি তখন চক্রাকারে নিম্নমুখি হয়েছিল।

২. চরম বামপন্থীদের উত্থান এবং উস্কানিতে বাংলাদেশ একটি অরাজক রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হতে শুরু করেছিল।

৩. তিনি সকল দলকে একত্রিত করে একটি মাত্র কর্তৃত্ববাদী জাতীয় রাজনৈতিক দল– বাংলাদেশ কৃষকশ্রমিক আওয়ামি লিগ গঠন করেন, যাকে সংক্ষেপে বাকশাল বলা হতো। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বাতিল করা হয় এবং শেখ মুজিব দেশের নেতৃত্ব বজ্রমুষ্ঠিতে ধারণ করলেন।

৪. শেখ মুজিব একটি অনুগত প্যারামিলিটারি বাহিনী- জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই বাহিনী সরকার বিরোধীদের উপর নিপিড়ন চালিয়েছিল এবং বাকস্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ করেছিল।

৫. লাগামহীন দুর্নীতি শুরু হয় এবং এতে সাধারণ জনগণের চোখে সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

৬. তবে শেখ মুজিবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর উপর বাংলাদেশের জনগণের আস্থা ঠিকই আছে, তবে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর পিঠে ছুরি বসিয়েছিল।

সর্বশেষ ভাবনা

শেখ মুজিবর রহমান শেষ দিকে হয়তো তেমন নিখুঁত ছিলেন না; জীবনের শেষদিকের ঘটনাগুলো চিরদিনের জন্য তাঁর অতীতের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের উপর একটি কালো ছায়া ফেলে রাখবে। তবে ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিব সর্বোচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। অত্যন্ত কঠিন সময়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের প্রত্যাশা নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

১৯৭৪'র সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সমগ্র পৃথিবীর নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি তাঁর দেশবাসীর একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেন। অনেকেই তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল।

সামরিক শাসনের মুখোমুখি হওয়া এবং বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করায় তিনি বিশ্বব্যাপী বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত সক্রিয়কর্মী প্রয়াত লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে একবার মন্তব্য করেন: 'একদিক দিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধি এবং ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব একজন বড় নেতা।'

মহাত্মা গান্ধি বা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের মতো স্বীকৃত না হলেও, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে শেখ মুজিবের অসামান্য অবদান জোরালো সাক্ষ্য বহন করে যে, বর্তমান সময়ে মানুষের অগ্রগতির পথে যে ক্রমবর্ধমান বাঁধা-বিপত্তি (চ্যালেঞ্জ) রয়েছে, সে-অবস্থায় নেতৃত্বের শক্তির কী প্রয়োজন।♦

জেনারেল অরোরা'র কাছে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন জেনারেল নিয়াজী

ইয়াহিয়া যদি মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করত তাহলে পাকিস্তান অখণ্ড রয়ে যেত

-আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী

অনুবাদ-গাজী সাইফুল ইসলাম

আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (Amir Abdullah Khan Niazi) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন লেফট্যানেন্ট জেনারেল, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্নর,

সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক হাই কমাণ্ডের সর্বশেষ অধিনায়ক। জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে, ব্রিটিশ-ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে, মিয়ানওয়ালির বালো-খেল গ্রামের একটি পশতু পরিবারে। ১৯৩২ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জুনিয়র নন-কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন এবং ভারতীয় সামরিক একাডেমিতে সামরিক বিজ্ঞানে তিনি বিএসসি ও প্যারাট্রুপার কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৫ম প্যারাট্রুপারে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে কমিশন লাভ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে অংশ নেন। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক হাই কমাণ্ডের সর্বশেষ অধিনায়ক হওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়াজি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৪টি মেডেল পান। পাকিস্তানের হয়ে ১৯৬৫ সালে পাঞ্জাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মির ও শিয়ালকোটেও তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। করাচি ও লাহোরে তিনি মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তান বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসন দাবি করে। কিন্তু তাতেও নানান টালবাহানা করছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে (যা বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকায় ৩৯ নম্বর স্থান লাভ করেছে) পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা যখন গণদাবিতে পরিণত হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' নাম দিয়ে কসাই (বুচার) টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী অতর্কিতে রাতের অন্ধকারে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১ কোটি হিন্দু শরনার্থী বন্ধু প্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠাতে থাকে।

অন্যদিকে ২৫ মার্চ ও পরবর্তী গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হওয়ায় টিক্কা খানকে অপসারণ করে নিয়াজীকে তার স্থলে নিয়োগ দেয় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ টিক্কা খান নিয়াজির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পাকিস্তান চলে যায়। এরপর নিয়াজীর নের্তৃত্বে পাক বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশজুড়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। তার অনুমোদনেই গড়ে উঠে রাজাকার, আলবদর, আল শামস ইত্যাদি নামে কুখ্যাত সব আধা সামরিক বাহিনী।

পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার হিসেবে ২৭ নভেম্বর ১৯৭১, নিয়াজী ঢাকার সাভারে রাজাকার বাহিনীর কমান্ডারদের প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শেষে বিদায়ী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

জেনারেল নিয়াজী

২৫ মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৮ মাস ধরে চলা যুদ্ধকালে সারাদেশের আনাচে-কানাচে মুক্তিবাহিনীর ছড়িয়ে পড়ে। তাদের উপর্যপরি গুপ্ত হামলার ব্যাপক সাফল্যে পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। তারা সীমান্ত এলাকার সেনা ইউনিটগুলো (বা আঞ্চলিক ক্যাম্প) থেকে পশ্চাৎপসারণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতের জম্মু ও পাঞ্জাবের বিমানবন্দরে হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়। এতে উভয়দেশের মধ্যকার বিরাজমান উত্তেজনা ফ্ল্যাশপয়েন্ট পৌঁছে। প্রতিক্রিয়ায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, মধ্যরাতের যুদ্ধ (war at midnight) ঘোষণা করেন। জলে-স্থলে-আকাশে যৌথবাহিনীর হামলা জোরদার হওয়ায় ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সৈনিকসহ জেনারেল নিয়াজী যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান ভেঙে যায়। ৯৩ হাজার সৈনিকসহ যুদ্ধবন্দি হিসেবে নিয়াজী ভারতের একটি কারাগারে স্থানান্তরিত হন। এরপর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবন্দি বিনিময় সিমলা চুক্তির আওতায় অন্যান্য

সৈনিকদের সঙ্গে নিয়াজী পাকিস্তানে ফেরত যান। পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক হাই কমাণ্ডের অধিনায়ক যুদ্ধে পরাজয়ের পুরো দায় চাপিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ১৯৭৫ সালে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে দূর করে দেয় এবং হামুদুর রহমান তদন্ত কমিশন (Hamoodur Rehman Inquiry Commission) গঠন করে।
২০০১ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট আংশিক প্রকাশিত হয়। এতে নিয়াজিকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি করার সুপারিশ করা হয়। এভাবে ঢাকা পতনের তিন দশক পরে, ৮৬ বছরের বৃদ্ধ অসুস্থ নিয়াজি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে রাজি হন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য। ১৯৯৮ সালে তিনি রচনা করেন আত্মস্মৃতি ও আত্মসমর্থনমূলক 'দ্য বিট্রেয়েল অব ইস্ট পাকিস্তান' বইটি। এতে তিনি টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী, ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পাকিস্তান বিভক্তির জন্য দায়ী করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, লাহোরে ইন্তেকাল করেন। *Rediff.com* এর পক্ষে এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন **আমির মির**।

প্রশ্ন : হামুদুর রেহমান কমিশন প্রকাশিত হলে একটি তরতাজা বিতর্কের জন্ম হলো। সরকার অনুমোদিত সুপারিশমালায় বলা হলো, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বিপর্যয়ের (পতনের) জন্য দায়ী সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর : পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের জন্য যারা, বিশেষত যে সব উর্দিপরা লোক দায়ী, তাদের শাস্তির বিধান করতে হবে– এমন জনদাবির সঙ্গে আমিও একমত ছিলাম। সেই বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানে ফিরে, আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কোর্টমার্শাল (সেনা আইনে বিচার) প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে চেয়েছি। কিন্তু তখনকার সেনাপ্রধান টিক্কা খাঁন আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তিনি চাননি পেণ্ডোরার বাক্সটি আবার খোলা হোক। এ ধরনের যে কোনো পদক্ষেপ সদর দপ্তরের যুদ্ধ পরিচালনায় অদক্ষতা প্রমাণ করতে পারে আর সংরক্ষিত সেনাবাহিনির অধিনায়ক হিসেবে টিক্কা খানের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, হামুদুর রহমান কমিশনের পূর্বে আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যাখ্যাত ছিল, কিন্তু কোর্টমার্শাল প্রত্যাখ্যাত ছিল না। পাকিস্তানের সেনা আইন মোতাবেক, আপনার পক্ষে আপনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও সাক্ষী দাঁড় করাতে পারবেন। বিশেষত যখন আপনার চরিত্র ও সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে এ অবস্থাটি সদর দপ্তরেরই নিজস্ব দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে। ফলোশ্রুতিতে আমাদেরও আর কখনওই সেনা আইনে বিচার হয়নি। ফলে খুব সহজেই আমি অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। কারণ কমিশনও আমার

যুক্তি-তর্কের সঙ্গে একমত হলো যে, আত্মসমর্পণের আদেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান-ই দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন কমিশন আপনার যুক্তি মেনে নিয়েছে যে, আত্মসমর্পণের আদেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দিয়েছিল। কিন্তু মোশারফের সময় প্রণিত রিপোর্টে দেখা যায় আপনিসহ বেশ ক'জন জেনারেলকে পরাজয়ের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

উত্তর : আমি যদি ওই বিশাল ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী হতাম, তাহলে আমার কোর্টমার্শাল হলো না কেন? যদিও টিক্কা খান আমাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। সেনাপ্রধান হওয়ার সুযোগে টিক্কা খান কাসুরে আমার জন্য বরাদ্দকৃত দু'টি চৌকোণ সীমান্ত এলাকা বাতিল করে দেয়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে একটি ইংরেজি দৈনিকে একটি বিবৃতিতে টিক্কা খান বলেন: আমরা লে. জেনারেল এ এ খান নিয়াজীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো প্রমাণ পাইনি, যিনি লে. জেনারেল জগজিৎ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কারণ ইয়াহিয়া খান তাকে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাকে সেনাবাহিনীতে আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সাধারণ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাকে অবসরে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন : আপনার বক্তব্য অনুযায়ী, ঢাকা পতনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একমাত্র দায়ী ব্যক্তি, আপনি শুধু তার নির্দেশ মেনেছেন?

উত্তর : না। ইয়াহিয়া খানের পাশাপাশি আরো ক'জন ব্যক্তিত্ব পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে তাদের

দোষারোপ করা হয়নি। রিপোর্টে উন্মোচিত হয়নি বহু ব্যক্তিত্ব ও বিষয় সম্পর্কে যেগুলো পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনে জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে এবং শেষত জিন্নাহর পাকিস্তানকে ভেঙে দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

প্রশ্ন : রিপোর্ট আত্মসমর্পণের কোনো আদেশ নথিভুক্ত করেনি। যাহোক, আপনি (পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক হিসেবে) যে 'দুর্দান্ত চিত্র এঁকেছেন তা দৃষ্টে' দেখা যায় উচ্চতর কর্তৃপক্ষই আপনাকে আত্মসমর্পণের একটি সম্মতিপত্র দিয়েছিল এবং এতে আরো বলা হয়েছিল যে, যদি একান্তই প্রয়োজন হয়। আরো বলা হয়েছিল, আপনি ঢাকাকে রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে করলে এ আদেশ অমান্য করতে পারেন।

উত্তর : আমি ধর্মের নামে শপথ করে বলছি যে, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে আমি আত্মসমর্পণের সুস্পষ্ট নির্দেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু এরপরও আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। যাহোক, সে সময় জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ও এয়ার চিফ মার্শাল রহিম আমায় ফোন দিয়েছিলেন। তারাও বলছিলেন সদর দপ্তরের (জিএইচকিউ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর নির্দেশমত কাজ করার জন্য। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা তখন খুবই নাজুক। তখন এমন এক পর্যায় যে, আমাকে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে রাজি হতে বলা হয়েছিল– যাতে সৈনিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

যাহোক, আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান রিজার্ভ সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে, দু'টি সাঁজোয়া যানসহ পদাতিক বাহিনীকে তিনটি ডিভিশনে ভাগ করে প্রতি আক্রমণ চালালে একীভূত থাকত আর যুদ্ধের ফলাফলও অনেকটাই বদলে যেত।

প্রশ্ন : কমিশন দেখতে পেয়েছিল, আপনার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে লুট, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার মতো কাজে জড়িত হয়ে পড়েছিল– এ ব্যাপারে আপনি বলবেন?

উত্তর : পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই আমি অসংখ্য রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পারি যে, সৈনিকরা লুট, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার মতো কাজে আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং কোনো সংবাদ ছাড়াই রাষ্ট্রবিরোধী এলাকা বিশেষে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোর বিনাশ করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ আমি আমার ঊর্ধ্বতন বসদের এক চিঠিতে জানাই যে, ঝামেলা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। আমি চিঠিতে পরিষ্কার লিখলাম যে, অহরহ ধর্ষণের খবর পাচ্ছি, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানী নারীরাও এদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আরো জানালাম যে, কর্মকর্তা

পর্যন্ত এমন গর্হিত কাজ করছে। তাদের কর্মকাণ্ড খুবই লজ্জার। যাহোক, বারবার সতর্কতা আর কড়া নির্দেশাবলি পাঠানো সত্ত্বেও কর্মকর্তাগণ এই অরাজকতাপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে পারেনি। সৈনিকদের এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে তাদের যুদ্ধ দক্ষতাকে অধোগতি করেছে।

ইয়াহিয়া খান

প্রশ্ন : সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে আপনার ব্যর্থতার মূল্যায়ন আপনি কীভাবে করবেন? পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর অপমানজনক আত্মসমর্পণের দায় কি আপনি স্বীকার করেন?

উত্তর : আমাদের ৪৫,০০০ সৈনিক যুদ্ধ করছিল আধা মিলিয়ন ভারতীয় সৈনিক, লাখের কাছাকাছি মুক্তিবাহিনী আর বাংলার শত্রুভাবাপন্ন জনসাধারণের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে ওই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য জন্য আমার দরকার ছিল ৩০০,০০০ সৈনিক। অধিকন্তু ওই সময়, আমরা মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এরপরও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম বিরাম না দিয়ে।

যদি হামুদুর রহমান মনে করে যে, আমরা একটি বনভোজনে ছিলাম, সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারত। আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে দেন যে, আমার অধীনস্থ সৈনিকরা পূর্ব পাকিস্তানে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

যাহোক, আমাদের যুদ্ধশক্তি অক্ষুণ্ন থাকার পরও ১৯৭১ সালে শেষত আমাদের পরাজয় ঘটে। বিশেষ করে যখন ক্ষমতার বদলে আমাদের বন্দুকের নল আবদ্ধ হয়ে যায়।

ক্ষমতার জন্য ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব আর ভুট্টোর মধ্যকার অমিমাংসিত দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিই ১৯৭১ সালের গোলযোগ। ইয়াহিয়া ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, ভুট্টো ক্ষমতা পেতে চায়। আর মাঝখান থেকে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বিজয়ী হিসেবে মঞ্চে আবির্ভূত হয়। আমি মনে করি, সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল। সে সময় ভুট্টোর ভাষণ জ্বালাময়ী ছিল বটে কিন্তু ছিল অন্তসারশূন্য। কিন্তু ওই দুর্দান্ত লোকটি যে ক্ষমতার জন্য কুস্তি শুরু করে দিয়েছিল– যদি মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করত তাহলে পাকিস্তান অখণ্ড রয়ে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, হামুদুর রহমান কমিশন ভুট্টোর কোনো দোষই দেখেনি।

প্রশ্ন : কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেনাপ্রধানের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কারণে ১৯৭১ সালের বিপর্যয় ঘটেছে। যাহোক, জেনারেল টিক্কা খান, সাহেবজাদা এয়াকুব আলী খান (ইস্টার্ন কমান্ডের সাবেক অধিনায়ক) ও রাও ফরমান আলী (নিয়াজীর উপদেষ্টা) সকল প্রকার দোষারোপ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কেনো? তারা কি নির্দোষ?

উত্তর : কমিশনের এই তিনজনকে বাদ দেয়াকে সমর্থন করি না। এটা বিস্ময়কর, পাকিস্তানের খণ্ডকরণে টিক্কা, ইয়াকুব ও ফরমানের কোনো দায়ই নেই? প্রকৃতপক্ষে, ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান হিসেবে ইয়াকুবের নিষ্ক্রিয়তা পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির অবনতি দ্রুততর করেছিল। যখন প্রতিটি বিষয় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল, ইয়াকুব পালানোর সুযোগ খুঁজতে লাগল। শেষে চাকরিতেই ইস্তফা দিলো। এভাবেই সে তার বিবেক চাপা দিয়ে তাড়নামুক্ত হলো। অথচ বিদ্রোহী জাতিটির জন্য তার ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। ইয়াহিয়া তাকে পদচ্যুৎ করে। কিন্তু পরে ভুট্টো তাকে পূর্বের পদে বহাল করে আমেরিকায় পাঠায় অ্যাম্ব্যাসাডর বানিয়ে। প্রতারণার কী পুরস্কার!

হামুদুর কমিশন তাকেও অব্যাহতি দিয়েছে। এর ফলে যখনই কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হলো, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে সেনা কর্মকর্তাদের চাকরি ছেড়ে যাওয়ার ভূমি মসৃণ হলো। একইভাবে রিপোর্টে টিক্কা খানের নাম নেই। অথচ তার ২৫ মার্চের বর্বরোচিত হামলার কারণে মানুষ তাকে কসাই (butcher) নামে আখ্যায়িত করেছিল। কমিশন তার হায়েনাসুলভ আচরণকে বিবেচনায় নেয়নি।

একইভাবে রাও ফরমান আলী প্রসঙ্গ আসতে পারে। সে ছিল ঢাকা অপারেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

প্রশ্ন : ভুট্রোর সরকার হামুদুর রহমান কমিশন জনসমক্ষে প্রকাশ করল না কেনো?

উত্তর : শেষমেষ উদ্ভূত যে সব পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তান দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে এতে তার দায়-দায়িত্বও সমান সেটা প্রকাশ পাওয়ার ভয়েই ভুট্টো হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। ভুট্টোর সহযোগিতায় গঠিত সাতজনের একটি কমিটির প্রতি অনুমতি ছিল রিপোর্টটিতে একবার চোখ বুলনোর জন্য। সেই কমিটিরই সুপারিশ ছিল রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। ভুট্টো পরে নিজের ক্ষমতাবলে এর ৩৪ পষ্ঠা সংশোধন করেছিল।

প্রশ্ন : আপনি জোর দিচ্ছেন যে, হামুদুর রহমান রিপোর্ট ত্রুটিপূর্ণ, আংশিক ও ভুট্টোর দ্বারা প্রভাবিত। অপরপক্ষে, ক্ষমতার দরজায় থাকা কেউই মনে হয় চায় না ঢাকা পতনের জন্য দায়ী জেনারেলদের কোর্টমার্শাল হোক। এমন চিন্তা মাথায় রেখে আপনি কোনো দৃঢ় পরামর্শ রয়েছে– অপরাধীদের সাজার আওতায় আনার ব্যাপারে?

উত্তর : ১৯৭১ এর পরাজয়ের সঠিক কারণ আর দোষীদের শাস্তির জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বেশি শর্ত সংযোজন করে একটি নতুন কমিশন নিয়োগ করা অপরিহার্য। এই কর্মকাণ্ড পরিচালনার সভাপত্বি করবেন সেনাবাহিনীর প্রধান। দু'টি সিন্ডিকেট এতে অংশ নেবে।

এতে থাকবে বহু আকর্ষণীয় সব অনুশিলনী, বহু প্রয়োজনীয় পাঠ এখান থেকে শেখা যাবে। সেনাবাহিনীর জন্যও এ জন্য শিক্ষণীয় যে, তারা এখান খুঁজ নিতে পারবে, ক্ষুদ্র, ক্লান্ত, দুর্বলভাবে সজ্জিত হয়েও পূর্বাঞ্চলীয় সৈনিকেরা কেনো, কীভাবে বিহ্বলকর বিরূপ পরিবেশে ভয়ানক এক নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অপরদিকে, পশ্চিমাঞ্চলীয় সৈনিকেরা যথেষ্ট শক্তি, সম্পদ নিয়ে আরম্ভ করেও ব্যর্থ হলো? সহায়ক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১০ দিনে ৫,৫০০ বর্গমাইল রাজ্যংশ হারাতে হয়েছে।

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তানের পতন সুচিন্তিতভাবে বন্দোবস্তকৃত (deliberately engineered) এ বক্তব্য কি আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

উত্তর : ১৯৭০ এর নির্বাচনে মুজিবের বিজয় ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর পছন্দ হয়নি। কারণ ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্সি ছেড়ে যেতে হবে আর ভুট্টোকে বসতে হবে বিরোধী বেঞ্চে। যা ছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা বিরোধী। সুতরাং তারা দু'জন একত্রিত হলো, ভুট্টোর বাড়ির শহর লারখানায় বসে একটি সূক্ষ্ম ফন্দি আটল। যা পরে লারকানা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিতি পেয়েছিল। ফন্দি অনুযায়ী ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করলো আর আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে

প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল– কূটনৈতিকভাবে, ভয় দেখিয়ে, নানাবিধ চক্রান্তের জাল বুনে আর রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে।
এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় 'এমএম আহমেদ পরিকল্পনা'। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট আর ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল রাখার অনুমতি দেওয়া আর পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করা কোনো উত্তরাধিকার সরকার না রেখেই। সংসদ অধিবেশন (ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য) হওয়ার তারিখ ঘোষণার পর, রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ ছিল– এটি বর্জন করার। যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, তাই একে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। পরিশেষে, এই চক্রান্তকারীরাই লক্ষ্য পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো বর্জন করার সময় এসেছে এবং জনগণের অধিকতর ভালোর জন্য তাদের শান্তি আলোচনায় বসা উচিত?

উত্তর : আমরা ভারতকে বিশ্বাস করি না। একের পর এক ভারতের ক্ষমতায় আসা সরকারগুলো শক্তিশালী পাকিস্তানের ধারণা মেনে নিতে পারে না। তারা সর্বদাই চেষ্টা করে আমাদের দেশকে দুর্বলতর করতে। পূর্ববর্তী সকল রেকর্ডে দেখা যায়, ভারত সবসময় পাকিস্তানের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভবিষ্যতে যখনই সুযোগ পাবে, তারা পাকিস্তানকে ছাড় দেবে না। এমনকি এখন কাশ্মিরে ভারতের রয়েছে শত-সহস্র সৈনিক, জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুদ্ধের নামে তারা সেখানে নির্দোষ মুসলমানদের হত্যা করছে।
এমনকি অন্যথায়, জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মির বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভারতের কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে পারে না।

প্রশ্ন : যদি সুযোগ দেয়া হয়, কাশ্মির বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আপনি ভূমিকা পালন করতে রাজি আছেন?

উত্তর : না। আমি বরং ভারতেরই পক্ষপাতিত্ব করতে চাই। যদিও যুদ্ধ করার পক্ষে আমি অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এরপরও এখনও জম্মু-কাশ্মিরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কমান্ডের জন্য আমি প্রস্তুত।♦

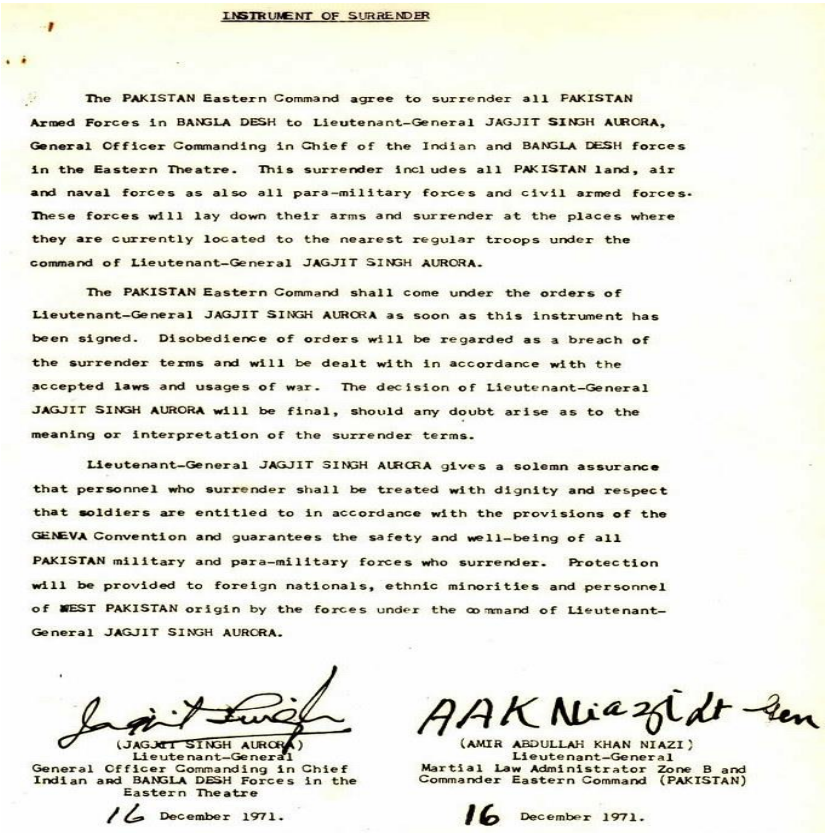

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল

বিজয়ের সেই সন্ধিক্ষণে

আতাতুর্ক কামাল পাশা

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে গোটা বাংলা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গত কয়েকদিনে ঢাকার বাইরের যে ক'টি ক্যান্টনমেন্ট ও গ্যারিশনে পাকিস্তানী সৈন্য ছিল, তারাও ট্যাংক ও আরমার্ড ভ্যানে করে ঢাকা সেনানিবাসগুলোতে এসে ঢুকে গেছে। বাইরে খুব একটা বের হচ্ছে না। কারণ তারাও বুঝতে পেরেছে, বাঙালিদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আর এ

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাবতীয় সরবরাহ বন্ধ। ঢাকায় পূর্বাঞ্চলের কমান্ডেন্ট আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর তরফ থেকেও বিশেষ কোন নির্দেশ আসছে না। তাই তারাও হাত গুটিয়ে বিভিন্ন সেনানিবাসে বসে আছে। ১৪ ডিসেম্বর থেকেই পূর্বাঞ্চলীয় বা বি জোনের সেনাপ্রধানকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হচ্ছে। তিনি পিণ্ডির আদেশের অপেক্ষায়।

ইতিমধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল থেকে তাকে দেয়া প্রস্তাবগুলো ছিঁড়ে ফেলে অশ্রুসিক্ত চোখে বেরিয়ে এসেছেন। সংবাদটি নিউইয়র্ক টাইমস্-এ ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে ছাপা হয়। উল্লেখ্য, আমেরিকার সময় বাংলাদেশের থেকে একদিন এগিয়ে থাকে। এ সংবাদের শিরোনাম ছিল 'ভুট্টো ধিক্কার দিচ্ছেন আর অশ্রুসিক্ত চোখে কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে আসছেন।' ১৬ তারিখে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস্-এর বিশেষ প্রতিনিধি হেনরী টার্নারের সংবাদটি বলা হয়েছে, জাতিসংঘ দপ্তর, নিউইয়র্ক, ১৫ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, বদন অশ্রুসিক্ত, 'আগ্রাসনকে বৈধতা দেয়া'র অভিযোগ এনে আজ নিরাপত্তা কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে আসেন। কাউন্সিলের বাইরে তিনি বলেন, 'আমি এই সংগঠনটিকে ঘৃণা করি, তাদের মুখও দু'চক্ষে দেখতে চাই না, এর থেকে আমার ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াই ভালো।' তারপর তিনি নিয়মিত সদস্য আগা শাহীসহ বিস্ফোরিত সাত জনের ডেলিগেশন দলকে নিয়ে, কার্পেটের মূল হল থেকে বিস্মিত কূটনীতিকদের অতিক্রম করে হালকা একটি বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

ভুট্টো তার এ ধরণের তাৎক্ষণিক বিষোদ্গারের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করলেন না। কিন্তু 'দীর্ঘসূত্রী কৌশল' ও 'অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবৈধ রণকৌশল'-এর দিক উল্লেখ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ক্ষমতার জোরে ভিটো প্রয়োগের দিকটি নির্দেশিত করেন– ভারতের একজন সমর্থক, যে সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তে আসতে বলছে।

চেয়ারটি পেছনে ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলবার আগে ভুট্টো কাউন্সিলে যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে :

'সম্মানীত সভাপতি, আমি একটি ইঁদুর নই। জীবনে আমি কখনো ইঁদুরের মতো চলিনি। আমি নরহত্যার মুখোমুখি হয়েছি, আমি জেলে প্রবেশ করার মুখোমুখি। আজ আমি আর ইঁদুরটি নই। কিন্তু আমি আপনাদের নিরাপত্তা কাউন্সিল পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকাটা আমার আত্মসম্মানে বাঁধছে এবং আমার দেশের জন্যও এটি অসৌজন্যমূলক। যে কোন সিদ্ধান্ত নিন, ভার্সাই চুক্তির থেকেও আরো কোন খারাপ চুক্তি করুন, আগ্রাসনকে বৈধ করুন, দখলকে বৈধ করুন, আমি

তাতে অংশ নেব না। আমরা যুদ্ধ করে যাব। আমার জন্য আমার দেশ কথা শুনছে।

'কেন আমি এই নিরাপত্তা কাউন্সিলে আমার সময় অপব্যয় করব? আমি আমার দেশের অংশকে ছেড়ে দেবার মতো অজ্ঞদের দলের কেউ নই। আপনাদের নিরাপত্তা কাউন্সিলকে, আপনারা যারা এখানে আছেন, তারাই এখানেই আপনারা থাকুন, আমি চললাম।

বৈঠক চলতে থাকল

যখন তিনি বেরিয়ে গেলেন, ঘিরে থাকা প্রতিনিধিবর্গ বাকশূণ্য হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকের সভাপতি, ইসমাইল বি. টেলর কামারা তিউনিসিয়ার রশিদ দ্রিসকে বলার অনুমতি দিলেন এবং অধিবেশনটি গতকাল এবং তার আগের দিনের মতো চলতে শুরু করল।

করিডোর ধরে ভুট্টো যখন যাচ্ছিলেন তখন তিনি বলছিলেন পাকিস্তান এই কাউন্সিলের সঙ্গে বা জাতিসংঘের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে যাচ্ছে না। 'রাষ্ট্রদূত শাহী থাকছেন।'

Zulfikar Ali Bhutto denouncing U.N. Security Council

Bhutto Denounces Council And Walks Out in Tears

By HENRY TANNER
Special to The New York Times

UNITED NATIONS, N. Y., Dec. 15—Pakistan's Foreign Minister, Zulfikar Ali Bhutto, his face streaked with tears, walked out of the Security Council today after accusing it of "legalizing aggression."

Outside the chamber, he said: "I hate this body. I don't want to see their faces again. I'd rather go back to a destroyed Pakistan."

Then, followed by seven grim-faced members of his delegation, including the regular representative, Agha Shahi, Mr. Bhutto strode down the carpeted main hall past milling groups of surprised diplomats, and was driven off in a misty rain.

Mr. Bhutto did not specify the immediate reason for his action. But, in referring to "dilatory tactics" and "filibustering," he appeared to allude to successive vetoes by the Soviet Union — a supporter of India — of resolutions calling for troop withdrawals.

Mr. Bhutto's parting words to the Council, before he ripped up his notes, pushed back his chair and rose, were these:

"Mr. President, I am not a rat. I've never ratted in my life. I have faced assassination attempts, I've faced imprisonment. Today I am not ratting, but I am leaving your Security Council.

"I find it disgaceful to my

Continued on Page 17, Column 1

Yutaka Nagata/United Nations

Mr. Bhutto, the Foreign Minister of Pakistan, leaving the meeting. In the foreground is Swaran Singh of India.

Weeping Bhutto Leaves Council, Saying It Legalizes Aggression

The New York Times
Published: December 16, 1971
Copyright © The New York Times

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ বাংলাদেশ নিয়ে জাতিসংঘের অধিবেশনের প্রকাশিত প্রতিবেদন

নিরাপত্তা কাউন্সিল দ্বিতীয় দফা সান্ধ্য বৈঠকে বসল

কাউন্সিল সন্ধ্যেয় দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হল। চীনা ও রুশ প্রতিনিধি, যারা প্রথম সন্ধ্যের মূলবক্তা ছিলেন, তারা মহাশক্তিধরদের তিক্ত রাজনীতি ও মতাদর্শগত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগগুলো পরস্পর বিনিময় করল।

কিন্তু রাত ১১.০০টার দ্বিতীয় সেশন শুরুর কিছু আগে মনে হচ্ছিল যে, আগামীকাল মহাশক্তিধরদের মাঝে ভাঙনের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা, স্যার কলিন ক্রো ও জ্যাক কসিসকু-মরিজে একটি যুগ্ম প্রস্তাবনা উপস্থাপন করলেন যেখানে বলা হলো একটি নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হোক পাকিস্তান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি ইয়াকুব এ মালিক পশ্চিমা কূটনিতিকদের সামনে একটি অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব আনলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ঢাকায় পতন হয়েছে, তার প্রচ্ছায়া রয়েছে। অন্যান্য প্রতিনিধিরা আশা করছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ঢাকার পতনে কাজ করবে। গভীর রাতে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়ে যায়।

বেরিয়ে যাবার পর ভুট্টো আবারো এসে বৈঠক চলাকালীন সংসদে প্রবেশ করেন এবং সোভিয়েত প্রতিনিধি ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি আপনাকে কমরেডের মতো দেখছি না। বরং, দেখটি আপনি জারের মতো হাসছেন।

ভুট্টো যখন বের হয়ে এসে তার পিয়েরে হোটেলক্ষে ঢুকছিলেন, তখন তার ফোনে তার ছেলের কণ্ঠ ভেসে আসে, বাবা, পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয়েছে। সেখানকার পাকিস্তান সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।

বিকেল চারটায় যখন যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে তখন ভারতীয় পত্রিকায় কুলদ্বীপ নায়ার ১৬ ডিসেম্বর একটি সংবাদ পাঠান, শিরোনাম ছিল 'ভারতীয় পার্লামেন্ট ইন্দিরার প্রতি হর্ষোধ্বনিতে উল্লাস করে ওঠে'। খবরটি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে ছাপা হয় যা পরেরদিন বাজারে পাওয়া যায়। এটি নিম্নরূপ :

পাকিস্তানর পূর্ব অংশের সৈন্যরা গ্রীনিচ মান সময় ১১:০১ মিনিটে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভারত তিন ঘণ্টা পর একক সিদ্ধান্তে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর সব ধরণের অস্ত্রবিরতি কার্যকর করেছে।

আজকের দিনটি গণতন্ত্রকামীদের বিশাল এক বিজয়ের দিন। প্রথমদিকে ভারতীয় পূর্ব কামান্ডের অধিনায়কের সেনাপ্রধান ম্যানেশ'য়ের আহ্বানসত্ত্বেও শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না।

তারপর পাকিস্তানি সেনাপ্রধান লেফ্‌টনেন্ট-জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর কাছ থেকে একটি আবেদন আসে, সময়টি ৬ ঘণ্টা বেড়ে দেয়া হোক যখন ভারত বুধবার গ্রীনিচ মান সময় ১১:৩০-এ বোম ফেলা থামিয়ে দেয়। অবশেষে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন লেফ্‌টেনেন্ট জেনারেল পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এসে নামেন এবং তাদের সমর্থনে থাকে বিমান ও নৌবাহিনীর সদস্যরা।

এর আগেই মন্ত্রীপরিষদের বিশেষ সংসদ অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের সাথে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্রবিরতি কার্যকর করেছে। এই সিদ্ধান্তটি মন্ত্রীপরিষদের উভয় কক্ষে পাঠানো হয়।

মিসেস গান্ধী যিনি পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সংবাদটি এবং ভারতের একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির সংবাদটি মন্ত্রীপরিষদে ঘোষণা করেন তখন সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং এই বিজয়ের নেত্রীর প্রতি হর্ষোধ্বনি করে ওঠেন। সংসদ সদস্যরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্লোগান দিতে থাকে, 'ভারতমাতা দীর্ঘজিবি হোক', 'ইন্দিরা জিন্দাবাদ।'

যাঁরা গত দু'দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের আনাগোণা লক্ষ্য করছিলেন এবং এ নিয়ে বেশ শংকিত ছিলেন তাঁরা শুধু হাঁফ ছেড়েই বাঁচলেন না বরং বিজয়োল্লাসের দু'ঢোক বেশি মদ্য পান করলেন যেন।

যা হোক, অন্যদিকে চীন, দিল্লিকে একটি বিক্ষোভের নোট পাঠালো যে ভারত ক্রমাগতভাবেই ভারত-সিকিম সীমান্ত লংঘন করে চলছে। ভারত এ সময় সংক্ষিপ্ত কিছু চৈনিক সৈন্যদের নেফায় অস্বাভাবিক চলাচল লক্ষ্য করছিল যে এলাকাটি দিয়ে চীন ১৯৬২ সালে বেআইনী অনুপ্রবেশ করেছিল।

এক ভারতীয় পর্যবেক্ষক এদিন মন্তব্য করেন, পাকিস্তানিরা এ যুদ্ধে ৪০টি ট্যাংক হারিয়েছে যেখানে ভারত হারিয়েছে মাত্র ১৫টি। (ইন্ডিয়ান টাইমস্, ১৬.০১.৭১)।

এ ছাড়াও সারা বিশ্বে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক সংবাদ প্রকাশ হয়। তার অনেকগুলো এখনো আমাদের আর্কাইভের সংগ্রহে নেই, তবে বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সেগুলো এখনো সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

আত্মসমর্পণের দলিলে যা লেখা ছিল : পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশে অবস্থিত তার সমস্ত বাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, দাপ্তরিক আদেশকৃত এবং বাংলাদেশ বাহিনীর উপস্থিত কর্মকর্তাদের

কাছে আত্মসমর্পণে সম্মত হল। এ আত্মসমর্পণের ভেতর সব পাকিস্তান ভূমির ওপর সব পাকিস্তানি সৈন্য, প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনী অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এই বাহিনীগুলো তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে, যেখানে যারা যেভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছে, তারা সবাই জগজিৎ সিং অরোরার কাছে এই অস্ত্র সমর্পণ করবে।

এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী লেফ্টন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার আদেশের আওতায় আসবে। আদেশের অমান্য এই চুক্তির বরখেলাপ বিবেচিত হবে এবং যুদ্ধের গৃহীত আইন অনুযায়ী তার কার্যক্রম চলবে। লেফ্টেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত থাকবে, যদি এই চুক্তির কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা বা কোন বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

লেফ্টেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের, প্যারা-মিলিশিয়া দলের সব সদস্যদের এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে এবং জেনেভা শর্ত অনুযায়ী বন্দি সৈন্যদের যে মর্যাদা ও সুবিধা দেয়া হয়, তার নিশ্চেয়তা বিধান করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সব বিদেশী সম্প্রদায়ের, বর্ণগত সংখ্যালঘুদের এবং বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সবার প্রতি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছেন লেফ্টেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
লেফ্টেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা	নিয়াজী
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইসলামের খেদমতে জাতির পিতা

অগ্রপথিক প্রতিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন মাত্র ৫৫ বছর সাড়ে ৪ মাস। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তিনি আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মহানায়ক। তাঁর এই ক্ষণস্থায়ী জীবন বিপুল বর্ণাঢ্য ও গৌরবময়। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। তিনি স্বাধীন এই রাষ্ট্রের যেমন স্থপতি একইভাবে আমাদের বাংলাদেশে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারেরও স্থপতি। ইসলামের খেদমত ও মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক তৈরিতেও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের অসামান্য গুনাবলিতে তিনি তৎকালীন সারাবিশ্বের নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা সন্মান ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। ২০২০ বর্ষ জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ 'মুজিববর্ষ'।

ইউনেস্কোর মাধ্যমে সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ইসলামের খেদমতে অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ–

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

দেশের সকল শ্রেণীর আলেম-ওলামা যাতে একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে ইসলামের প্রচার কার্য পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্টে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়:

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;
(ট) বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধন করা;
(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলির যে কোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক কাজ সম্পাদন করা;
বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর আলো বিশ্ব সভ্যতাকে আলোকিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঈদে মিলাদুন্নবী দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলছেন ঃ
ধর্ম নিয়ে আর ব্যবসা করা চলবে না
সর্বত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) পালিত হচ্ছে

রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু আলেম-ওলামাদেরকে সংগঠিত করে মহানবী (সা)-এর জীবন ও কর্ম জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য ঢাকায় একটি সীরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। এই সীরাত মজলিসের উদ্যোগে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের রবিউল আউয়াল মাসে বৃহত্তর আঙ্গিকে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করা হয়। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে এই মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন। আমাদের এই উপমহাদেশে এটিই ছিলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের প্রথম ঘটনা। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছর পক্ষকালব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করে আসছে।

হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা

পাকিস্তান আমলে হজ্জযাত্রীর জন্য কোন সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিলো না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজ্জযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রীদের জন্য জাহাজ ক্রয়

বাংলাদেশের হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ্জ করতে পারেন এজন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর পরবর্তী সরকার এই জাহাজটিকে 'প্রমোদ-তরী' হিসেবে ব্যবহার করে এবং সমুদ্র পথে হজ্জযাত্রা বন্ধ করে দেয়।

মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এর নাম রাখেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'।

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ

কওমী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় জামিয়া মাদানিয়া দারুল উলুম যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাগরিকত্ব প্রদান ও বাংলাদেশে আনয়ন

মুসলিম জাগরণের কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিকত্ব প্রদান করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু হয়। ফলে বেতার ও টিভির অনুষ্ঠান সকালের শুভ সূচনা ও দিবসের কর্মসূচি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত এ ব্যবস্থাই বর্তমানে চালু রয়েছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লিখিত দিনসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান

ইসলামে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুই প্রথম আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান জারী করেন।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক
ইসলামী ফাউণ্ডেশন
অধ্যাদেশ-১৯৭৫ জারি

ইসলামী কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, একাডেমী, মসজিদ ইত্যাদি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইসলামের অবদানের উপর গবেষণার প্রচেষ্টা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের মৌলিক ইসলামী আদর্শ প্রচার এবং ইসলামী ইতিহাস দর্শন, আইন ও ব্যবহার শাস্ত্রের গবেষণা ও গঠন-পাঠনের উন্নয়ন, পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি সাধনের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে "ইসলামী ফাউণ্ডেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" জারি করেন। গতকাল এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে এ কথা বলা হয়।

পত্রিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ জারি'র সংবাদ

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ

পাকিস্তানী আমলে ঢাকার বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে চলতো জুয়া, হাউজি ও

বাজিধরা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাজিতে হেরে অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আমাদের প্রিয়নবী (সা) বৃক্ষরোপণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন : 'যদি মনে কর আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর।' মহানবী (সা)-এর এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে বৃক্ষরোপণ করে সেই স্থানের নাম রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ঢাকা মহানগরীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বৃক্ষরাজী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বহন করে চলছে।

বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

তাবলীগ জামাত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের একমাত্র কাজ। এই সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াতি কাজে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ তাবলীগী ভাই এই জামাতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু টঙ্গি বিশ্ব ইজতেমার এ স্থানটি বরাদ্দ করেছিলেন বলেই ইজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

কাকরাইল মসজিদ

কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ

বর্তমানে কাকরাইলের যে মসজিদে কেন্দ্রীয়ভাবে তাবলীগ জামাতের মারকাজ অনুষ্ঠিত হয় এই মসজিদটি ছিল খুবই অপ্রশস্ত। বঙ্গবন্ধু কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মারকাজ মসজিদের জন্য স্থান বরাদ্দ করেন এবং মসজিদটি তাঁরই নির্দেশে সম্প্রসারিত হয়।

রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি কমিউনিস্ট দেশ। সেদেশে বিদেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেত না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সেদেশের নেতৃবৃন্দের একটি সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার পর প্রথম রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামাতের যেসব দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই যুদ্ধে বাংলাদেশ তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগদান করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠে।♦

সুপ্রীম কোর্ট দিবস

বঙ্গবন্ধু ও সুপ্রীম কোর্ট

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

১৮ ডিসেম্বর 'সুপ্রীম কোর্ট দিবস'। ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর তৎকালীন প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালনরত বিচারপতি মো. আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞার সভাপতিত্বে উভয় বিভাগের বিচারপতিগণের ফুল কোর্ট সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী যেহেতু ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রথম কার্যক্রম শুরু করেছিল, সেহেতু প্রতিবছর ঐ দিনটিকে বাংলাদেশ 'সুপ্রীম কোর্ট দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। সেই থেকে ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

১৮ ডিসেম্বর '৭২ দিনটি ছিল সরকারী ছুটি। কিন্তু তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ঐ দিন ছুটি প্রত্যাহার করে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের 'দৈনিক কার্য তালিকা (কজ লিস্ট)' প্রণয়ন করেন এবং ঐ তারিখ হতে সুপ্রীম কোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়।

উল্লেখ করা প্রাসংঙ্গিক হবে যে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসার পরদিন অর্থ্যাৎ ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ 'দি প্রভিশনাল কন্সটিটিউশন অফ বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২

জারি করা হয়। ঐ আদেশের অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে- যা একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি যাঁরা সময়ে সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাঁদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ঐ দিনেই রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমকে বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির ৫নং আদেশ অর্থাৎ 'দি হাইকোর্ট অফ বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২' জারি করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট। স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের গোড়াপত্তন এভাবেই। রাষ্ট্রপতির ১১৪ নং আদেশ অর্থাৎ 'দি হাইকোর্ট অফ্ বাংলাদেশ (সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্ট) আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রপতির ৫নং আদেশের কার্যকারিতা দেয়া হয় ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ হতে। ১৬ আগষ্ট '৭২ বাংলাদেশ হাইকোর্ট-এর আপীল বিভাগ গঠন এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়।

১৮ ডিসেম্বর '৭২ সুপ্রীম কোর্ট উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন সুপ্রীম কোর্ট অংগনে। ভাষণ দিয়েছিলেন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, আইনজীবীসহ উপস্থিত সূধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে। বক্তব্যের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন ও আত্মত্যাগকারী আইনজীবীসহ সকলের প্রতি। তিনি বলেছিলেন, 'যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমাদের সুপ্রীমকোর্ট, আজ আমাদের দেশে আইনের শাসন হতে চলেছে, তাদের আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন।' বঙ্গবন্ধু সুপ্রীম কোর্ট অংগনে শহীদ আইনজীবীদের নাম ফলক দেখতে না পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এ ভাবে, 'আমি নিশ্চই সুখী হতাম, যেমন পি.জি হসপিটালে গিয়ে দেখি যে, এত জন ডাক্তারের নাম, যারা শহীদ হয়েছে। তাদের নাম লেখে ফলক করে রাখা হয়েছে। আমি সুখী হতাম বারের সদস্য ভাইয়েরা, যে যে সহকর্মীরা যারা শহীদ হয়েছেন– এই সুপ্রীম কোর্টের গেটে এসে দেখতে পেতাম যে শহীদের নাম সেখানে লেখা রয়েছে। বেয়াদবী মাফ করবেন, আপনাদের আমি অভিযোগ করছি না।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছিলেন– 'আইনের শাসনে আমরা বিশ্বাস করি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অনেক আমরা সংগ্রাম করেছি এবং এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক মানুষের রক্ত দিতে হয়েছে। বাংলাদেশে আইনের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেজন্যই শাসনতন্ত্র এত তাড়াতাড়ি দিয়েছিলাম। যদি ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছা, যদি রাজনীতি করতাম আপনারা নিশ্চই আমার পাশে যারা বসে আছেন জানেন যে, তালে তাল মিলিয়ে- গালে গাল মিলিয়ে বহুকাল ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। কিন্তু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই, রাজনীতি করেছিলাম মানুষের মুক্তির জন্য।

সে মানুষের মুক্তি মিথ্যা হয়ে যাবে যদি মানুষ তার শাসনতন্ত্র না পায়। আইনের শাসন না পায়। . . . .। আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি। আপনারা আইনের শাসন পরিচালনা করবেন।' সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আইনের মধ্যে যদি গোলমাল হয়, সেখানে আপনাদের সংশোধন করার ক্ষমতা রয়েছে। মনে করেন তাতে পরিপূর্ণতা হচ্ছে না– আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে নতুন আইন পাশ করা। এমন আইন পাশ করা উচিত হবে না দেশের মধ্যে রেশারেশি সৃষ্টি হয়।'

সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মধ্য থেকেই যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ও শাসনতন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে বঙ্গবন্ধু সে বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন– 'সেজন্য আইনের শাসন করতে হলে, আমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে মৌলিক জিনিস রয়েছে সেটাকে মেনে নিয়েই করতে হবে বলেই বিশ্বাস করি। আমি আইনজীবী নই, আপনারা আইনজীবী, আপনারা বুদ্ধিজীবী, আপনারা ভালো বুঝেন। আমি আইনজীবী কোন দিন হতে পারি নাই, তবে আসামী হওয়ার সৌভাগ্য আমার যথেষ্ট হয়েছে জীবনে। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে দেশের শাসনতন্ত্রকে যাতে উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়, সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন। কারণ সে ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে আপনাদের দেওয়া হয়েছে। যে আইন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হবে তার সম্পর্কে মতামত দেওয়ার অধিকার আপনাদের আছে, নাকচ করার অধিকার আপনাদের রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে যায়। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি আপনাদের এ্যাডভাইজ দিতে চাইনা, আপনারা এ জিনিসটা আমার চেয়ে অনেক ভাল বুঝেন।. . . .। আইনের শাসন এদেশে হবে এবং আমাদের শাসনতন্ত্র যে হয়েছে, আমরা চেষ্টা করব সকলে মিলে চেষ্টা করব যাতে এটার যে

আদর্শ দেয়া হয়েছে আদর্শকে রক্ষা করা এবং এখানে সুপ্রীম কোর্টের অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং আপনাদের যে সাহায্য সহোযোগিতা প্রয়োজন, আপনারা সেটা পাবেন।' বঙ্গবন্ধু বিচার বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'আপনাদের কোন কাজে আমরা ইন্টারফেয়ার করতে চাইনা। আমরা চাই যে, দেশের আইনের শাসন কায়েম হউক'। পাশাপাশি তিনি বিচার বিভাগকে দেশের মানুষের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তবে একটা কথা আছে, দেশের অবস্থা আপনাদের বিবেচনা করে চলা উচিত। অনেক সময় যদি বেশি আপনারা করতে যান তবে দেশের মধ্যে যদি আইন শৃংখলার খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে যেমন আমিও কষ্ট ভোগ করব, আপনিও কষ্ট ভোগ করবেন, সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখারও প্রয়োজন আছে। . . . । দেশের মানসিকতা, দেশের আবহাওয়া বিবেচনা করেও চলতে হবে। তা না হলে শুধু আইন করে চলেনা কোন কিছুই।' রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি অরগানের সাথে অন্যান্য অরগান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা চলতে পারে না, চললেও কষ্ট হয়। সেজন্য যখন বলেন কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেট, সেখানে আমি বলি না ইন্ডিপেডেন্ট। কারণ রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই এবং শাসনতন্ত্রের ভেদ কাঠামোর মধ্যেই আমাদের সবকিছুতেই চলতে হবে। একজন্যই আমাদের যার যা কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে।'

সংবিধানের স্কীম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'দুনিয়ার কোন শাসনতন্ত্রেই খারাপ কথা লেখা নাই। কিন্তু সেটা যদি আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে কাজ করে এগিয়ে না যাই তাহলে দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। আমাদের শাসনতন্ত্র আমাদের আদর্শ আছে। যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। যেমন চারটা স্তম্ভের উপরে এই দেশ, আমরা তাকে ফান্ডামেন্টাল রাষ্ট্র আদর্শ বলি। চারটা রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই দেশ চলবে। এটাই হইল মূল কথা। এইটাকে যদি ধ্বংস করতে কেউ না পারে, যেমন এক্সিকিউটিভ, যেমন আইনসভা, তেমনি আপনাদের সুপ্রীম কোর্টেরও অধিকার রয়েছে যাতে এর উপরে কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আপনারা যখন বলেন, আমরাও তখন বলেছি এবং আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, জুডিশিয়ারি সেপারেট হবে এক্সিকিউটিভ থেকে। অনেকে বলেন, কমপ্লিট সেপারেশন। কোন রাষ্ট্রে কোনকিছুই কমপ্লিট সেপারেশন হয় না। একই সঙ্গে একটা অন্যটার সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। একই রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে যে অরগানগুলি থাকে যেমন জুডিশিয়ারি একটি অরগান, যেমন এক্সিকিউটিভ একটি অরগান। এরমধ্যে

যদি কোপারেশন না থাকে, তাহলে সেদেশের মধ্যে কেওয়াজ সৃষ্টি হয়, যে কেওয়াজের ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালের পর থেকে আপনাদের যে দশা হয়েছিল সে দশাই হবে। একটার সঙ্গে অন্যটা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু যার যার যেখানে ক্ষমতা রয়েছে সেটাকে নিশ্চই প্রতিপালন করবেন।. . . . .। কেউ কোনদিন হস্তক্ষেপ করবে না আপনাদের অধিকারের উপরে। সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং যতটা তাড়াতাড়ি হয় আমরা চেষ্টা করব যাতে জুডিশিয়ারী সেপারেটভাবে কাজ করতে পারে।'

মাতৃভাষা বাংলা রায় লেখার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন, যে ইংরেজী ভাষায় অনেক কিছু আমাদের চলছে। ইংরেজী ভাষা আমাদের রক্তের মধ্যে কিছু কিছু আচরণ করেছে সন্দেহ নাই এবং ইংরেজী ভাষা আমাদের পরিভাষার প্রয়োজন সেটাও বুঝি, কিন্তু এ পরিভাষার জন্য যদি চিন্তা করি, হয়ত বাংলা ভাষা হবে না। সে জন্যই আমরা শাসনতন্ত্রে কোন ভাষা মিডিয়া রাখি নাই, যে পাঁচ বৎসরে দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা থেকে ইংরেজীতে পৌঁছতে হবে। আপনারা চেষ্টা করুন যেভাবে আপনাদের ভাষা আসে তার মধ্য থেকেই জাজমেন্ট লেখার চেষ্টা করুন। এভাবেই যা শেষ পর্যন্ত ভাষায় পরিণত হয়ে যাবে।. . . . . । মাননীয় প্রধান বিচারপতি সাহেব, বেয়াদবী মাফ করবেন। এইটা আমাদের, যা আমি দেখেছি, অনেক দেশে ঘুরেছি যারা তাদের অক্ষর পর্যন্ত নাই, তারা নিজের ভাষায় কথা বলে, নিজের ভাষায় লেখে এবং জাজমেন্ট দেয়।'

বঙ্গবন্ধু বক্তব্য শেষ করেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের কাছে এই প্রত্যাশা নিয়ে– 'এত বিপদ আপদ, এত অভাব-অনটন, দুঃখ কষ্টের মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি এজন্য দিয়েছি যে আইনের শাসনে বিশ্বাস করি এবং সেজন্যে শাসনতন্ত্র দেয়া হয়েছে। আশা করি আজ আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের শাসনতন্ত্র হয়েছে যার জন্য বহু রক্ত গেছে– এ দেশে আজ আমাদের সুপ্রীম কোর্ট হয়েছে। যার কাছে মানুষ বিচার আশা করে।'

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। রক্তস্নাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পাল্টিয়ে দেয়ার জন্যই জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের সাজা নিশ্চিত করে বিচার বিভাগ বঙ্গবন্ধুর সামান্য ঋণ শোধ করেছে মাত্র। রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রকে অক্ষুন্ন রেখে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী দ্রুততার সাথে বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধুর আহ্বান-প্রত্যয় বাস্তবায়ন, তাঁর স্বপ্নসাধ পূরণ ও রক্তঋণ শোধ করার দায়-ভার আজ সুপ্রীম কোর্টের উপর।♦

লেখক : বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

স্বদেশের মুখ

সোহরাব পাশা

এখানে আঙুলে ফোটে আগুনের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল
শ্রেষ্ঠশিল্পী মুক্তিসেনা শোণিতে এঁকেছে স্বদেশের মুখ
মেঘলা সন্ধ্যায় বিরুদ্ধ হাওয়ায় মাথা নত করে না এদেশ
শহিদ মিনারগুলো অনুবাদ করে প্রাণের পঙক্তিমালা
ওরা আঁধার রাতের দৃপ্ত আলোর মিছিল–অমিত সাহস
দূরবর্তী বেভুল দ্বীপের জ্যোতির্ময় বাতিঘর।

এইখানে জ্বলে ক্ষিপ্র সূর্যের অপূর্ব চিত্রকল্প
অমিতাভ চেতনায় বিনিদ্র রবীন্দ্র-নজরুল
রংধনু রোদের শব্দে আঁকা সেরা কবি জয়নুল
এইখানে হঠাৎ বিষণ্ন রাত্রি নামে–বেদনায়
পাখিরাও ভুলে যায় ডানায় রচিত স্বপ্নভাষা
পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট শোকভেজা স্বরলিপি
আমার প্রাণের বর্ণমালা আর স্বদেশের মাটি
নিরন্তর জ্বলে অনির্বাণ শিখা শোকের দহন।

হে স্বদেশ 'এখন দুখিনী' নও আর
চারদিকে জেগে আছে দেখো ঘুম ভাঙানো পাখিরা
নিঝুম রাত্রির শেষে ডাকে ওই সুবর্ণ সকাল
এখনো উদ্ধত ওই বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত তর্জনী।
বঙ্গবন্ধুর নামে হেসে ওঠে প্রিয় বাংলাদেশ।

ভাষা এক গোধূলিয়া শান্তিছায়া

হাসান হাফিজ

রক্তপলাশের লাল জড়িয়ে ভরিয়ে আছে
মাতৃভাষা তোমার শরীর
তরুণের লাল রক্ত তোমাকে দিয়েছে দীপ্তি
অহঙ্কার আকাশপ্রতিম
তুমি স্নিগ্ধ তুমি শান্তি তুমি মগ্ন মাতৃক্রোড়
সোদামাটি তোমারই বন্দনা করে
তুমি হও জলবতী মেঘের মল্লার
গান হও কোকিলের, গোধূলিয়া ছায়া।

ভাষা তুমি অত্যাশ্চর্য ভালোবাসা আনন্দ রঙিন
তুমি এক বিদ্রোহের ভরা নদী
যেখানে জোয়ার আছে তরঙ্গের অহমিকা আছে
ফুল্ল জলধারা আছে অবেগে সোহাগে স্বচ্ছ
তুমি এক নান্দনিক মননেরও নাম।

স্বপ্ন-বিজয়

গোলাম নবী পান্না

আঁধার ঠেলে সূর্য যখন আলো মেলে ধরে,
আলোক-রশ্মি দোর গোড়াতে ঝলোমলো করে।
আলোর মেলা দেয় মুছে দেয় হাজার রকম কালো,
কালো ছায়া সরে গেলে মুক্তা ছড়ায় আলো।
দেশটা জুড়ে কালো ছায়া হুমড়ি খেতে এলে,
দেশপ্রেমিরা কঠোর হাতে দেয় সে দূরে ঠেলে।
আমার দেশের আকাশনীলে কালো মেঘের ছায়া,
ছায়া কি আর মুছে দিতে পারে দেশের মায়া।
দেশের মায়া আগলে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতি,
স্বপ্ন-বিজয় হাতে পেয়ে খুশির মাতামাতি।
লাল-সবুজের পতাকাটা হয় তখনই আঁকা
শান্তি সুখের পরশ নিয়ে দেশের বুকে থাকা।

মুক্তিযুদ্ধ

মঈনুল হক চৌধুরী

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সকল কাজের প্রেরণা
মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবলেই
শত সহস্র স্মৃতি ভীড় করে হৃদয়ে
শিউরে ওঠে মন!
যুদ্ধের ভয়াবহতা আর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মহিমা
বুঝতে পারি তখন,
তিরিশ লক্ষ প্রাণের দামে
আর দু'লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে
পরাধীনতার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে বীর বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে মুক্তি।
স্বাধীনতা তাই একটি জাতির পরম পাওয়া-
বিশ্বের মানচিত্রে বাঙালি আজ স্বাধীন জাতি
বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে
আমরা তাই বার বার স্মরণ করি,
স্মরণ করি জাতির পিতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে
যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ-
মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার।

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু

আবদুস সালাম খান পাঠান

বাংলা স্বাধীন ভাষায়, স্বাধীন বাংলাদেশের ঘন সবুজের
বৃক্ষছায়ায়, নতুন জীবনের আহবান। দ্বীপ্ত শপথে, জয়বাংলার গান ,
যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশের কর্দমাক্ত মাঠঘাট নদীজল উর্বরতায়
আর, চৈত্রের তাপদাহ সবুজ তৃণছায়া ফসলি মাঠে নতুনের আঘ্রাণ,
স্বাধীনতার আনন্দে বিজয় নিশান, বীর শহীদদের ত্যাগে আত্মা মহীয়ান,
এদেশের খাঁটি দেশপ্রেম হৃদয়ের গভীর ভালোবাসার উচ্ছাসে
বজ্রকণ্ঠে সেই স্বাধীনতার ডাক, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ঐতিহাসিক ভাষণে – সংগ্রামী আহবান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
অঙ্গীকারে-ঐশ্বর্য, গৌরবে; একাত্তরের স্মৃতি-অম্লান।
রক্তিম সূর্যের আলোকছটায় সংগ্রামী শপথে কোটি কোটি
আপামর জনতার, যুবক-তরুণ ও কৃষকের অনুপ্রাণিত প্রাণ, উচ্চারিত
'জয় বাংলা' স্লোগান। সোনার বাংলা গড়ার শপথে আগুয়ান
এ বাংলাদেশ স্বাধীনতার বিজয় গৌরবে লাল-সবুজের পতাকা
উড্ডীন। এলো ঐ নতুন সুখী জীবনের সন্ধান!!
চির সবুজে ফুটিছে লাল-লাল কৃষ্ণচূড়া, বসন্তে অপরূপে ধরণী
সৌন্দর্যে রঙিন-শিমুলের লাল-বাগান!! শুধু স্বাধীনতার জয়গান।
নব আলোকে এ সুন্দর বাংলাদেশে যত সুনাম যশ, বিশ্ববরেণ্য
অনলবর্ষী বক্তা, মহান নেতার অমর কীর্তিতে সোনার বাংলার শান্তি সুখ;
সবার জাগরণে, মনেপ্রাণে, অমরত্বে, স্বাধীনতার স্থপতি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
স্বদেশের ভালোবাসায় কাতর প্রাণ, ফোটে রক্ত গোলাপ, প্রাণের শতদল,
বাংলা ভাষার উচ্চারণে উদাত্ত শিহরণে, অভিনব কাব্যছন্দে
সুষমা মন্ডিত বাংলার শব্দগান। 'বঙ্গবন্ধু' প্রিয় নাম, বিশ্বে এতো সন্মান
পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতার স্মৃতি উৎসব
মুজিব শতবর্ষে উল্লসিত বাঙালির প্রাণ।
বিশ্বে সাড়া জাগানো সোনালী স্বপ্ন পূরণে নতুন বাগানে
ফুটেছে নতুন ফুলের কুঁড়ি, পাপড়ির সুঘ্রাণ।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চির অম্লান।

লাল সবুজ পতাকা

শফিক তালুকদার

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই পতাকা
কোটি বাঙালির ভালোবাসা এই পতাকা
আমাদের সম্মান অর্জন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা এই পতাকা।
কারো অনুগ্রহে অনুকম্পায় না, চরম মূল্যে কেনা এই পতাকা।
সবুজ শ্যামলের মাঝে অঙ্কিত গাঢ় লাল আভা এই পতাকা।
সেই লাল আভায় আছে সঞ্চিত
লাখ শহীদের রক্তস্রোত হয়ে পুঞ্জিভূত।
আমরা ভুলি নাই ভুলবো না অগণিত
শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি, যারা যুদ্ধে শহীদ।
সেই শহীদদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ
এগিয়ে চলেছে দুর্বার বেগে
এগিয়ে যাবে শত বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে
এগিয়ে যাবে স্বাধীন বাংলাদেশ ।
উন্নয়নের স্রোতে ভেসে যাবে
যত অন্যায় অপকর্ম অন্ধ বিশ্বাস।
সাবাশ বাঙালি, সাবাশ বাংলাদেশ
তোমরা বীরের জাতি অসীম তোমাদের সাহস
তোমাদের অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয় পরাজিত শক্তি
প্রতিবেশী অনেক দেশ।
৭ মার্চের সেই বিশ্ব বিখ্যাত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠের উদাত্ত উচ্চারণ
স্বাধীনতার ডাক শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান
তোমাদের অনুপ্রেরণা এগিয়ে যাওয়ার সোপান।
তোমরা গড়বে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা
সে পথে এগিয়ে গেছি আজি মোরা অনেকটা
এখন পেছন ফিরে তাকানো উচিৎ না।
এই বিজয় দিবসে শুরু হোক
সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার পালা।

বাঙালি মহানায়ক
কাজী জাহাঙ্গীর

নীলাকাশ তত বড় নয়
যত বড় তোমার হৃদয়।

তুমি আছ খাঁটি বাঙালির
খাঁ খাঁ উদাম বুক জুড়ে,
শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা ভরে।

তুমি মুক্তির ডাক না দিলে,
বাঁশের লাঠি, বারুদ হয়ে কী করে করত গর্জন?
কী করে হতো অমর কবিতা,
৭ই মার্চ এর মৃত্যুঞ্জয়ী অর্জন!

তোমার যোগ্য উত্তরসূরি;
আজ বিশ্ব মানবতার জননী,
অশ্রু মুছে কর্মপ্রাণ বিনিদ্র রজনী।
বিশ্ব দরবারে, সেরাদের সেরা তিনি।

আজ অমৃত বাণী তোমার
বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল।
তলাহীন ঝুড়ির গুজব মুছে গেছে।
শুধু তোমার স্বপ্নডানায়,
বাঙালি আজ সওয়ার হয়েছে।

তোমার নামে বাঙালি আজ উপগ্রহ গড়েছে,
পারমাণবিক চুল্লিতে সারাদেশ করবে ঝল্‌মল্,
সমস্ত গ্রাম পাবে শহরের আদল।
নদীর তল ঘেঁষে সুগম পথ তৈরিতে
বাঙালি আজ পেয়ে গেছে অথৈই বল।

উন্নয়নে ঈর্ষা, তবুও বিশ্ব আমাদের চোখে হারায়,
তোমার দীক্ষায়, সুকৌশলী নেতৃত্বে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়।
বিশ্ববাসী শোন, মহানায়কের অমৃত বাণী;
'কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবা না'।

প্রার্থনা

মিজানুর রহমান

জীবনের আকাশে কত অমঙ্গলের রোষ
কত ব্যথার আঘাত লাগে নিঃশেষ
নিরাশায় পলকেই ছেয়ে যায় মন
প্রভু, তোমার সাহায্য যেন নেমে আসে তখন।

ঝড় যদি উঠে কভু জীবনের পালে
যদি হারাই পথ ঘুটঘুটে অন্ধকার কোলে,
যদি থেমে যায় গতি, আর চলতে না পারি
হে মহান, তোমার শক্তি যেন নিয়ে আসে আশার তরী।

গভীর হতাশা যখন বাসা বাঁধে মনের ভেতর
অশান্ত বেদনায় উছলে উঠে মনের প্রান্তর
হীনতা, দীনতা এসে ছেয়ে ফেলে জীবন
হে বিরাট, তখন তোমাকেই যেন বারবার করি স্মরণ।

পদে-পদে অবমাননা এসে কেড়ে নেয় জীবনের নীতি
শান্তি-স্বস্তি, স্থবিরতা সবই যেন হারায় গতি
পরিপূর্ণ অত্যাচারের নিপীড়ন নেমে আসে অন্ধকারে
তখন কি বিধাতা, শক্তি দেবে না একেবারে?

চলার পথের গতি যেন থেমে না যায় কভু
যেন চলতে পারি নির্মল বিশুদ্ধ জীবনে প্রভু
মানুষের মঙ্গলই হোক আমার জীবনের অভিষ্ট
হে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি যেন কখনো জীবনে না হই পথভ্রষ্ট ।

সূর্যের আলোক যেমন হেসে উঠে দিগবিদিক
তেমনি আলোর মশাল নামুক আমার চারিদিক
মঙ্গল সঙ্গীতে যেন উদ্ভাসিত হয় প্রাণের আঁখি
হে জ্যোতির্ময়, আমি যেন সদা তোমাকেই হৃদয়েতে রাখি।

বিপ্রতীপ

মুস্তাফা মাসুদ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যেদিন ঢাকা রেডিও থেকে প্রচার করা হলো, সেদিন জমিরের উৎসাহ আর উত্তেজনা ছিলো দেখার মতো। বঙ্গবন্ধু যখন উচ্চারণ করলেন: '... ... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম– আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম– স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন জমির মায়ের মাথার ওপর হাত রেখে বলেছিলো: মা, আমিও মুক্তিযুদ্ধে যাবো– বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন; আর আমরা কী বসে থাকতে পারি!

মা ছেলেকে আদর করতে করতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। বলেন– বা'জানরে, তুই আমার একমাত্র ছাওয়াল, বুকের মানিক। তোরে থুয়ে আমি থাকপো ক্যাম্‌নে!

জমির হাসতে হাসতে বলে– মা, এখনই তো যুদ্ধে যাচ্ছি না। চূড়ান্ত ডাক এলেই যেতে হবে, সেজন্য এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে। ওই যে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছেন– প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে তোমরা প্রস্তুত থাকো; তা হলে বোঝো, যুদ্ধ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। আর মা, আমি তোমার এক ছেলে, না? মাগো, মনে রাখবা, দেশ এবং দেশের স্বাধীনতা তোমার ছেলের চেয়ে অনেক বড়ো। আমি একা কেন, এ দেশের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ মায়ের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যাবে, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ।

মা ছেলের কথায় শক্তি ফিরে পান। তিনি বলেন– বা'জানরে, তোর কথাগুলো খুবই ভালো লাগলো। বঙ্গবন্ধু যহন কয়ছেন, তহন সবাইরেই স্বাধীনতার জন্যি ঝাঁপায়ে পড়তি হবে। তয় মা'র মন তো, তাই পয়লা ধাক্কায় এট্টু কাবু হয়ে পড়িছিলাম। এহন ঠিক, একদম ঠিক। বা'জান, তুই কোনো চিন্তা করবি না। সময়মতো আমি নিজহাতে তোরে সাজায়ে যুদ্ধে পাঠাবো। তয় তোর বাপ্‌রে তো চিনিস, তারে কিন্তু ভুলেও কিছু কওয়া যাবে না। তা'লি কিন্তু সব বরবাদ হয়ে যাবেনে, তোরও বিপদ হ'তি পারে তাতে।

জমির ছোট্ট শিশুর মতো মায়ের বুকে মাথা রাখে। তারপর বলে– মাগো, আব্বা কিছুই জানবে না। তা থাক ওসব। এখন আমাকে তুমি একটু বেশি করে আদর করো। যুদ্ধে গেলে কতদিন তোমার সাথে দেখা হবে না তার কী ঠিক আছে!

মা শান্ত গলায় বলেন: আমার আদর আর দুয়া সবসময় তোর সাথে থাকপে, তুই যেহানে যেভাবেই থাহিস না কেন। তবে এট্টা কথা মনে রাহিস বা'জান, মনে সব সময় সাহস রাখবি। কখনো ভয় পাবি না। মনে রাহিস, দেশটাও তোর কাছে মায়ের মতন। আমারে যেমন ভালোবাসিস, এই দেশটারেও তেম্নি ভালোবাসবি। দেশকে ভালোবাসা তো ঈমানেরই অংশ।

মায়ের কথা শুনে জমির একটু অবাক হয়– মা এতসব জানে! এতসব ভাবতে পারে! তাই মনে মনে খুশি হয় এই ভেবে যে, এই মা শত বিপদেও ভেঙ্গে পড়বেন না এবং সে-ও নিশ্চিন্তে যুদ্ধে যেতে পারবে।

মা-ছেলের কথা প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় বাবা ছমির সরদার ঘরে আসেন। তিনি এইমাত্র যোহরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে এসেছেন। তিনি স্ত্রী ও ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নেন, গুরুতর কোনো বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো একটা। তিনি খুবই ঝানু লোক। আইউব খানের বি.ডি (বেসিক ডেমোক্রাট) মেম্বার ছিলেন, তার আগে ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টও ছিলেন কয়েক দফা। তিনি শক্ত গলায় স্ত্রীকে জিগ্যেস করলেন– ফরিদার মা, কী ব্যাপার! মনে হয় তোমাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে? ঘটনা কি? কি রে, জমির? বিষয়টা কি?

জমির বাবাকে চেনে। উনি মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন সারাজীবন। এখন সেই মুসলিম লীগের কাহিল অবস্থা দেখে তিনি খুবই হতাশ। এজন্য তার রাগও বেড়ে গেছে। কথায় কথায় রাগ, বিরক্তি আর যাচ্ছেতাই গালাগালি করা তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির তাই বিষয়টাকে হাল্কা করার জন্য বাবার মনের মতো কথাগুলোই বলে– আব্বা, তেমন কিছু না। তবে ওই যে শেখ মুজিবের অসহযোগের কারণে কলেজে ক্লাস বন্ধ, মিটিং-মিছিল হচ্ছে। কখন কী বিপদ হয়– এসব নিয়েই কথা বলছিলাম। দেখেন তো আব্বা, এত গ্যাঞ্জাম কি ভালো লাগে?

জমিরের কথায় ছমির সরদার খুব খুশি হন। ভাবেন– ইদানিং যে তার ছেলে সম্পর্কে তিনি নানান আকথা-কুকথা শুনছেন, তা তাহলে সত্যি নয়! আরে, একজন জাত-মুসলিম লিগারের ছেলে পাকিস্তানের বিপক্ষে যায় কীভাবে! শেখ মুজিব একটা গ্যাঞ্জাম বাঁধানোর চেষ্টা করছে, কিছু লোক তার দলে জুটেও গেছে। কিন্তু খান সেনারা যখন সত্যি সত্যি হুংকার দেবে, তখন স-ব ঠান্ডা হয়ে যাবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার ঠোঁটে এক-চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। ঠোঁটের কোণে সেই হাসি ঝুলিয়ে রেখেই তিনি বলেন: বাবা রে, ওরা একটু নাচানাচি করছে, করতে দাও। আরে বাবা শেখ সায়েব, ইলেকশনে জিতেছে তো কি হয়েছে? তুমার ছয় দফা যে পাকিস্তান ভাঙ্গার অস্ত্র, তা কি আমরা বুঝিনে? তুমারে ক্ষমতা দিলি তো পাকিস্তানের কবর হয়ে যাবে, তাই কী করা ঠিক? তার জন্য এই জ্বালাও-পোড়াও-অসহযোগ এসব কেন? তা বাবা জমির, এসব নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করবা না। যাদের চিন্তা, তারা ঠিকই চিন্তা করছেন। তা যাও বা'জান, তুমি এখন খেয়েদেয়ে রেস্ট করগে। ফরিদার মা, আমাদের বাপ-বেটার খাবার দাও।

বাবার কথার মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পায় না জমির। এসব উনার গৎ-বাঁধা কথা। প্রায়ই বলেন। স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরাও এ-ধরনের কথা বলে। এমন কি ওদের কলেজের কয়েকজন ছাত্রকেও সে ঠিক এমন কথাই বলতে শুনেছে, ওরা ইসলামী ছাত্রসংঘ করে। তবে, গৎ-বাঁধা কথা বললেও ইদানীং কিন্তু ছমির সরদারকে মাঝে মাঝে বেশ চিন্তিতও দেখায়। তা হলে কি তার মনে ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করেছে? আর তার কারণ কি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা?

ছমির সরদার গ্রামের অবস্থাপন্ন গেরস্থ। অনেক জমাজমি। টাকা-পয়সা। সহায়-সম্পদ। গাছগাছালি, পুকুর, গরুবাছুর সবই আছে। তার চার মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েরা বড়, তাদের সবার বিয়ে হয়েছে। এখন বাড়িতে শুধু তিনি, তার স্ত্রী আর একমাত্র ছেলে জমির। ও স্থানীয় কলেজে আইএসসি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। তবে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কলেজ কার্যত বন্ধ, নানান মিছিল-মিটিং আর সমাবেশ লেগেই আছে। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই তাতে শামিল হচ্ছে। বাবা ঘোর বাংলাদেশ-বিরোধী, তাই তাকে এখনই জানাতে চায় না বলে

জমির প্রকাশ্যে মিটিং-মিছিলে যোগ দেয় না। কিন্তু গোপনে গোপনে সে সব আন্দোলন-সংগ্রামের সাথেই একাত্ম। তা ছাড়া তার বাবা এবং অন্য স্বাধীনতা-বিরোধীদের অগোচরে খুব সাবধানে বন্ধুদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিও নিতে হচ্ছে। বলা তো যায় না, কখন ঘর ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার চূড়ান্ত ডাক আসে! কিন্তু এত গোপনীয়তার পরেও ছেলের নামে কিছু কিছু কথা তার কানে আসে, যা শুনতে ভালো লাগে না তার এবং এসব কথা তার আদর্শেরও বিরোধী। কিন্তু ছেলের কথাবার্তা, চলাফেরা, হাবভাবের মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই এখনও পাননি তিনি। ছেলের কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা তো একেবারেই তার মনের মতো– খাঁটি পাকিস্তানি ঘরানার! তা হলে? তা হলে ওসব নিশ্চয়ই তার শত্রুদের মিথ্যে রটনা। আরে বাবারা, আমগাছে আমই হয়, তেঁতুল হয় না।– এমনি নানা কথা ভাবেন আর নিজের মনকে সান্ত্বনা দেন ছমির সরদার।

এভাবে কয়েক দিন যায়। জমির ও তার বন্ধুরা আরও বেশি জোরে-সোরে প্রস্তুতি নিতে থাকে। তরুণ-যুবাদের আরও বেশি সংখ্যায় সংগঠিত করতে থাকে। এমনকি কিছু ৩০৩-রাইফেলও ওরা জোগাড় করে ফেলে। পাশের গ্রামের এক অবসরপ্রাপ্ত ইপিআর সৈনিকের কাছে তারা সুযোগমতো ট্রেনিং নিতে থাকে কারিকর পাড়ার আমবাগানে। এরই মধ্যে ওরা বুঝে গেছে, সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা একটা প্রহসনমাত্র, এতে সময় ক্ষেপণ ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হবে না। যুদ্ধ অনিবার্য, শুধু চূড়ান্ত আহ্বানের অপেক্ষা।

এলো পঁচিশে মার্চের সেই কালোরাত। নিরস্ত্র মানুষের প্রতি হানাদারেরা চালালো বর্বর আক্রমণ। তারপর পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতের পরে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে এলো সেই চূড়ান্ত ঘোষণা– বঙ্গবন্ধু বাংলাশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন আর দেশকে স্বাধীন করার জন্য সবাইকে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ওই রাতেই তিনি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দি হলেন। এসবই জমির ও তার সাথিরা রেডিও মারফত জানতে পারে।

এরপর আর অপেক্ষা করা চলে না। ২রা এপ্রিল রাতেই ওরা বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আশ-পাশের গ্রামের এক শ' জন তরুণ চারটি দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা পথে রওনা দেয় গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে। অন্ধকার যে কতবড় বিশ্বস্ত আর উপকারী বন্ধু, এ রাতের আগে ওরা তা কোনোদিন বুঝতে পারেনি।

যেখান থেকে ওরা রওনা হয়েছে, সেখান থেকে ভারতীয় সীমান্ত পশ্চিম দিকে বড়জোর বিশ মাইল। তাই রাত শেষ হওয়ার আগেই ওরা সীমান্ত পার হয়ে নিরাপদে ওপারে পৌঁছে যায়।

পরদিন সকালে ছমির সরদার যথারীতি ফজরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হন। কিন্তু তাকে আজ খুব বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে। তবে কী কারণে এই

দুশ্চিন্তা, তা ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। ভোরের পরিবেশটাও কেমন যেন গুমোট। ঝিরি ঝিরি বাতাস নেই। গাছের পাতারা নড়ছে না। পাখিরাও উড়াল দিচ্ছে না ডানা মেলে।

মসজিদ থেকে আজ সোজা বাড়ি গেলেন না ছমির সরদার। তিনি গেলেন মাঠের দিকে। সরু যে মাটির রাস্তাটা সরকারি গোরস্তানের পাশ দিয়ে ঢেপাই বিলের দিকে চলে গেছে, সে-পথ ধরে তিনি অনেক দূর গেলেন। হঠাৎ দেখতে পান এক দল মানুষ বিলের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ছমির সরদার জানেন, এরা প্রাণের ভয়ে ভিটেমাটি ফেলে দেশ ছেড়ে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। কয়েক দিন থেকেই তিনি এমন দৃশ্য দেখছেন। ওদের যাওয়া দেখে তার বেশ লাগে। মনে মনে ভাবেন– বোঝ ব্যাটারা! জয় বাংলার পক্ষে ভোট দিয়েছিলি, এখন জয় বাংলায়ই যা। পাকিস্তানের পাক-মাটি তোদের জন্য না।– এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। মনের গুমোট ভাবটাও কেটে যায়।

তিনি আর সামনে না এগিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরেন। এরই মধ্যে সকালের সূর্যটা চারদিকে হাসি ছড়াতে শুরু করেছে। পাখিরাও ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে খাবারের সন্ধানে।

ছমির সরদার বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডাক দেন। তাঁর স্ত্রী জমিলা বেগম স্বামীর ডাক শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সরদার মোলায়েম গলায় বলেন: মুড়ি আর চা দাও।– এই বলে তিনি বারান্দায় তাঁর জন্য নির্ধারিত চেয়ারে গিয়ে বসেন। সামনে দাদার আমলের সেই খান্দানি টেবিল, তার এক পাশে বাহারি গড়গড়াটা শোভা পাচ্ছে।

মুড়ি আর চা ছমির সরদারের প্রতি সকালের সেমি-নাশতা, মানে আসল নাশতার আগের ছোট-নাশতা। এটা তার বহু পুরোনো খান্দানি অভ্যেস। সেমি-নাশতার পর আরাম করে গড়গড়ায় কিছুক্ষণ সুখটান দেবেন। এরই মধ্যে চামচা-মোসাহেবরা আসবে, চা-নাশতায় শরিক হবে তারাও। এ ধরনের খান্দানি রেওয়াজের মধ্যে বেশ মজা অনুভব করেন ছমির সরদার। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জমিলা বেগম এরই মধ্যে মুড়ি আর চা দিয়েছেন স্বামীর জন্য। বড় গামলায় আলাদাভাবে চামচাদের মুড়ি আর ফ্লাক্সে চা।

ছমির সরদার মুড়ি-চা খেয়ে গড়গড়ায় টান শুরু করেছেন। উপস্থিত অন্য দু'জন মুড়িতে কেবল হাত দিয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো উত্তর পাড়ার নোয়ামিয়া। তার কিছুক্ষণ পর এলো খালপাড়ের জলিল কারিকর। নোয়ামিয়ার

ভাব দেখেই কেন যেন সরদার সাহেবের বুকটা কেঁপে ওঠে। উনি ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করেন: কি রে, নোয়ামিয়া! খবর কি? এভাবে কাঁপছিস যে?

নোয়ামিয়া বেশ খানিকক্ষণ হাত ঝাঁকিয়ে হাউমাউ করে যা বলল, তা সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়: ও শুনেছে, থানা সদরে আজই শহর থেকে আর্মি আসবে শান্তি কমিটি আর রাজাকার বাহিনী গঠনের জন্য। ওদের বাড়ি থানার একেবারে কাছাকাছি হওয়ায় ওরা খুবই ভয় পাচ্ছে। তাই ওরা সরদার সাহেবের সাহায্য চায়। শান্তি কমিটি আর রাজাকার বাহিনী গঠনের বিষয় সরদার সাহেবের সবই জানা। তাকেই তো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বানানোর কথা। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে, শুধু উপরের লিডার আর আর্মির অফিসারেরা এসে আনুষ্ঠানিকতা সারবেন, এটুকু বাকি। কিন্তু তিনি যেন কিছুই জানেন না এমন ভাব করে বলেন: তাই নাকি! সর্বনাশের কথা তো! আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই এখন যা। আমি দেখবানে। তা জলিল, তুই কি খবর এনেছিস? তোর মুখ দেখে অবশ্য তেমন ভয়ের কিছু মনে হচ্ছে না। তো বল দেখি তোর খবর?

জলিল কারিকর একটু এগিয়ে আসে সরদার সাহেবের চেয়ারের দিকে। তারপর চাপা গলায় বলে: চাচা, ঘটনা এট্টা ঘটে গেছে কাল রাত্তিরি। শুনিছেন নাকি কিছু? সরদার সাহেবের বুকের ভেতরটা অজানা আশংকায় মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা কাউকে বুঝতে দেন না। ঠোঁটের কোণায় কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে রেখেই বলেন– আমি জানি না, এমন ঘটনা আবার ঘটে নাকি এ তল্লাটে? কী এমন বিশাল ঘটনা রাতের মধ্যে ঘটে গেলো, আর আমি জানলাম না! আরে, তা হলে তা কোনো ঘটনাই না!– এমনি তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা রাখতে চান তিনি।

এবার জলিল কারিকর একটু জোরের সাথে বলে– ঘটনাডা তা'লি আপনি জানেন না চাচা। ঘটনা গুরুতর– আমাগের এই এলেকার বহু ছাওয়াল-পাওয়াল গত রাত্তিরি মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। শোনা যাচ্ছে, এক-দুই শ' জন তো হবেই। কেউ কেউ কচ্ছে, চার-পাঁচ শ' হবে।– এ পর্যন্ত বলেই জলিল থামে। ঘটনাটা বলতে পেরে তার বুকটা যেন বেশ হাল্কা লাগছে।

ছমির সরদারের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। মনে হয় এক্ষুনি তিনিও পড়ে যাবেন। কিন্তু পড়েন না। দুশ্চিন্তার অথৈ সাগরে যেন হাবুডুবু খেতে থাকেন তিনি– আজ থানা সদরে এতবড় একটা প্রোগ্রাম! সেখানে তিনি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাবেন, রাজাকার বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করবেন, আর আজ এতবড় দুর্ঘটনা! এতগুলো মানুষ এক রাতে যুদ্ধে গেলো, আর তারা কিছুই জানলেন না, কিছুই করতে পারলেন না– আর্মিরা যদি এ বিষয়ে জিগ্যেস করে তো কী জবাব দেবেন! তিনি গভীর হতাশায় একেবারে চুপসে যান।

জমিলা বেগম এতক্ষণ ধরে সবকিছুই দেখছিলেন, শুনছিলেন। একটা কথাও বলেননি। ভাবলেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। বোমাটা এখনই ফাটাতে হবে, যাতে সরদারের কাহিল অবস্থা একেবারে কেরাসিন হয়ে যায়। তার সেই করুণ অবস্থা দেখে জমিলা বেগমের বড্ড ভালো লাগবে। তিনি এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললেন: ফরিদার বাপ, জমির তো ঘরে নেই।

সরদার সাহেব স্ত্রীর কথা শুনে বললেন– ঘরে নেই, তার মানে কী! বাথরুমে গেছে হয় তো। ফরিদার মা, তুমি এখান থেকে যাও তো! কাটা-ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিতে এসো না। যাও!

জমিলা বেগম তবুও নড়েন না। আবার বলেন– এ যাওয়া বাথরুমি যাওয়া না। ওর ব্যাগ, বেশকিছু কাপড়চোপড়, বুট জুতো, টচ লাইট– এসবও নেই। তাছাড়া, এই দেখেন ওর টেবিলের উপর এই কাগজটা পা'লাম। আমি তো পড়তি জানিনে। আপনি পড়ে দেহেন।

ছমির সরদার ছোঁ মেরে স্ত্রীর হাত থেকে কাগজটা নেন, মেলে ধরেন চোখের সামনে। সংক্ষিপ্ত ক'টি লাইন গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা: আব্বা, আমার সালাম নেবেন। মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলাম। আপনি দেশের বিরুদ্ধে যে অন্যায়, যে পাপ করছেন, তা এতে কিছুটা হাল্কা হতে পারে। দোয়া করবেন।– আপনার জমির।

চিঠি পড়ে খানিকক্ষণ থ' মেরে থাকলেন ছমির সরদার। তারপর আশ্চর্য ঠান্ডা গলায় বললেন– এই, তোমরা এখন যাও। যশোর থেকে উনারা আসছেন। আমি খেয়েদেয়ে রেডি হবো। ওখানে যেতে হবে।

উপস্থিত সবাই চলে যায়, শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন জমিলা বেগম। সরদারের সাথে এক্ষুণি যে তার একটা ফাইট হবে, তা বুঝতে পেরে মনকে শক্ত করেন তিনি। তার ধারণাই ঠিক। ছমির সরদার চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন– ছেলে বড়ো হয়েছে। সে তার পথে গেছে। আমি আমার পথেই থাকব। কে হারে কে জেতে, দেখা যাক। তা একটা কথা জমিলা বিবি, তোমার একমাত্র ছেলে যুদ্ধে গেছে, তা তুমি কাঁদছ না কেন কও তো? তোমার চোখে তো এখন পানির সাগর থাকার কথা, থৈ থৈ কান্না থাকার কথা। তার বদলে তোমাকে বেশ ডাঁটো মনে হচ্ছে, বিষয়টা কী খুলে কও তো?

জমিলা বেগম একটুও ঘাবড়ান না। শক্ত গলায় বলেন– শোনেন, আমারে উকিলির মতো জেরা না ক'রে নিজির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করেন। আপনিই তো বললেন ছেলে বড়ো হয়ছে, সে তার পথে গেছে। তয় তারে তার পথে যা'তি দেন। আপনি এহন শান্তি কমিটির চেয়ারমেনের পদটা পাওয়ার জন্যি যা যা করা দরকার, তাই নিয়ে ভাবেন। জমিরির চিন্তা করলি আপনার ক্ষেতি ছাড়া লাভ হবে নাহানে। যান, গোসল করে আসেন। খা'য়ে সি.ও. অফিসি যান। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জমিলা বেগমের কথাগুলো যুক্তিসংগত আর আন্তরিক মনে হয় ছমির সরদারের কাছে। তাই তো! যে ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে তার পিছনে ছুটে লাভ কী? তার চেয়ে নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভেবে সরদার মোলায়েম গলায় বলেন– তুমি ঠিক বলেছো ফরিদার মা। যে গেছে, তার কপাল নিয়ে গেছে। যাক গে! মরুক গে! আমি আমার চিন্তাই করি....
গোসল করে খেয়েদেয়ে যথাসময়ে সি.ও. অফিসে পৌঁছান ছমির সরদার। গিয়ে দেখেন, জামাত ও মুসলিম লীগের বেশ কিছু নেতা-কর্মী তার আগেই এসে পড়েছে। তারা সরদারকে দেখে চোখাচোখি আর ফিসফিসানি শুরু করে দেয়। দু'-এক জন অবশ্য সালাম দেয়, তবে বড়ো শুকনো– তাতে সম্মান বা আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। সরদার সেসব দেখেও না দেখার ভান করেন। ঠোঁটের মরা-হাসি কোনো রকমে ধরে রেখে সেই সালামের জবাব দেন। কয়েক জনের সাথে করমর্দনও করেন। তারপর সামনের সারির একটা চেয়ারে বসে স্টেজের পেছনের ডিজাইন-করা ব্যানারটি পড়তে থাকেন। ব্যানারে প্রধান অতিথি, বিশেষ আতিথিদ্বয় ও সভাপতির নামের মধ্যে তার নাম না দেখে তিনি ভীষণ অপমানিত বোধ করেন। এরপর বক্তৃতা হলো, শান্তি কমিটি গঠন হলো, রাজাকার বাহিনী গঠনের বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, কিন্তু সরদারের নাম একবারও উচ্চারিত হলো না। এর সবকিছুই যে জমিরের কারণে হয়েছে, তা বুঝতে তার বাকি থাকে না।
অনুষ্ঠান-শেষে সবাই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন গেটের সামনে দেখা হয় 'উপরের' এক বড়ো লিডারের সংগে। এই লিডার একসময় সরদার সাহেবের অনেক নিচের পজিশনে ছিলেন। এখন অনেক ওপরের পজিশনে– প্রধান নীতিনির্ধারক বলা যায়। আর্মিরা নানা বিষয়ে তার পরামর্শ নেয়। এই নেতা সরদার সাহেবকে দেখেই সামান্য হেসে মন্তব্য করেন– আপনার ছেলেই যদি মুক্তিযুদ্ধে যায়, তাহলে আমরা আপনার ওপর ভরসা রাখি কী করে! সরদার সাব, আই অ্যাম সরি।– বলেই গটগট করে একটা ঝকঝকে মাইক্রোতে উঠে পড়লেন তিনি। সাথে জনাচারেক অস্ত্রধারী গার্ড।
সরদার সাহেব আর কারও সাথে কথা বললেন না। শের শাহ রোড ধরে নীরবে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই তিনি বলেন– শয়তান জমির্যা, আমার সাথে তুই গাদ্দারি করলি! আমারে তুই যেভাবে অপমান করলি, সুযোগ পেলে আমি তার বদলা নেবোই। ছেলে বলে তুই কোনো মাফ পাবি না। পাকিস্তানের বিপক্ষে গিয়ে তুই তো এখন কাফের-বেদ্বীন হয়ে গেছিস। তোকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়াও এখন পাপ। সারা জীবন যে সুনাম কামাই করেছি, এক ধাক্কায় তুই তা শেষ করে দিলি! তোকে আমি ছাড়ব না!

ছেলেকে মনে মনে ধমক-হুঁশিয়ারি দিয়ে এখন বেশ ভালো লাগছে ছমির সরদারের। বুকের ওপর চাপা পড়ে-থাকা ক্ষোভ-দুঃখের ভারী পাথরটা যেন অনেকটা হালকা লাগছে

মে মাসের এক বিকেল। কোত্থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো কসিম রাজাকার। কসিম সরদার সাহেবের খুব বিশ্বস্ত। আগে সবসময় কাছে কাছে ঘুরঘুর করত। এখন সরদার চাচার পজিশন ভালো না, তাই কোথাও দেখলেও না দেখার ভান করে কেটে পড়ে। তবে আজ না এসে পারেনি। কেননা, ওরা খবর পেয়েছে– খুব তাড়াতাড়ি মুক্তিবাহিনী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসবে। রাজাকারেরা নাকি এই এলাকায় খুব বেশি অত্যাচার করছে, তাই এ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুক্তিবাহিনী। তারা যখন এই ক্যাম্প আক্রমণ করবে, তখন সেই বাহিনীতে জমির এবং এই এলাকার আরও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে, এটা বুঝতে কষ্ট হয়নি ধূর্ত কসিম রাজাকারের। অনেক দিন সে সরদার চাচার নেমক খেয়েছে, তাই এ খবরটা তাকে দেওয়া সে দায়িত্ব মনে করেছে। সরদার সাহেব পুকুরপাড়ে বসে ছিলেন উদাস চোখে। এমন সময় কসিম খবরটা দিয়েই আবার দ্রুত চলে যায়।
মুহূর্তে সরদার সাহেবের চিন্তার স্রোত বইতে থাকে দ্রুতবেগে। সেই স্রোত নানান জায়গা ঘুরে অবশেষে থেমে গেলো তাদের বাড়িতে, যেখানে জমিলা বেগম নামের এক মা বসে আছে তার একমাত্র ছেলের পথ চেয়ে। সরদার আঙুলে তুড়ি দিয়ে বলে ওঠেন– পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! হিসেব একদম সোজা। এখানে যুদ্ধে আসলে জমির একবার তার মাকে দেখতে আসবেই। তখন ওকে ধরিয়ে দেবো। জমির‍্যা, তখন বুঝবি মজা ক্যামন। আমি তোর লাশ দেখতে না পারলে শান্তি পাবো না।
ওইদিন বিকেলেই ছমির সরদার গেলেন রাজাকার ক্যাম্পে। কমান্ডার তাকে দেখে একটু অবাক হয়। বলে– সরদার সায়েব আপনি এখানে, এই ক্যাম্পে! আপনার ছেলে তো মুক্তি.. ...
–আমার ছেলে মুক্তি তো আমার কী? আমি তো সারাজীবন পাকিস্তানি! জানে না এলাকার মানুষ? জানো না তোমরা? –রাগে, দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলেন ছমির সরদার।
কমান্ডার শহীদউদ্দিন তাড়াতাড়ি বলে– আরে, কাঁদছেন কেন সরদার সায়েব? কাঁদবেন না। শান্ত হয়ে বসেন। এই, কে আছো, দুই কাপ চা দ্যাও।
ছমির সরদার কমান্ডারের কথায় কিছুটা শান্ত হন। তারপর বলেন– আমি যে জন্য এসেছি, তাই আগে শোনো। খুব গোপন রাখবা। শোনো, কয়েক দিনের মধ্যে নাকি এই ক্যাম্প মুক্তিরা আক্রমণ করবে? তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার ছেলে জমির সেই সময় এখানে আসবে– এটা তো ধরে নেয়া যায়, তাই না? আর

সে যদি এখানে যুদ্ধে আসে তাহলে এক মিনিটের জন্য হলেও সে তার আম্মাজানের সাথে দেখা করতে যাবে, ঠিক? তাহলে এই সুযোগে তাকে ধরাও সহজ হবে, ঠিক?

কমান্ডার হ্যাঁ-করে চেয়ে থাকে সরদারের মুখের দিকে। তার চোখে পলক পড়ছে না। মুখে কথা যোগাচ্ছে না। পিয়ন চা দিয়ে গেছে, তাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কোনো দিকে খেয়াল নেই কমান্ডারের। তার সামনে মানুষ, না একটা জানোয়ার বসে আছে– সেই চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। কমান্ডারকে চুপ থাকতে দেখে খেঁকিয়ে ওঠে সরদার– কমান্ডার, বেহুঁশ হয়ে গেলে নাকি?

কমান্ডার এবার হুঁশ ফিরে পায়। ব্যস্তভাবে বলে– না, না সরদার সাহেব, হুঁশেই আছি। আপনি খাঁটি ঈমানদার মানুষ, সহীহ পাকিস্তানি মর্দে মুমিন। আপনার কাছে যে দেশের স্বার্থই সবকিছুর উপরে, তা আমরা আগে বুঝতি পারিনি। আপনার কথা আমি 'উপরে' জানাবো। সব ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবেনে দ্যাখপেন। তা এহন কী করা যায়, কনদিনি?

ছমির সরদারের মাথায় যেন শয়তান ভর করে। দু' চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। শক্ত গলা তার– শোনো, ওকে ধরতে পারলে তোমাদেরও লাভ, আমারও লাভ। আমার মনে হচ্ছে জমিরই এখানকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার থাকবে। ওকে যদি তোমরা খতম করতে পারো, তাহলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। এটা তোমাদের লাভ। আর আমার সাথে গাদ্দারির বদলা নেওয়া হবে, এটা হলো আমার লাভ।

কমান্ডার মুক্তিবাহিনীর আসন্ন হামলার ব্যাপারে ক'দিন থেকে একটু চিন্তায় ছিলো। এখন ছমির সরদারের 'দেশপ্রেম' দেখে তার শক্তি অনেকটা ফিরে আসে। তার দলে অনেক সাহসী আর 'দেশপ্রেমিক' রাজাকার আছে, তারা ঠিকই মুক্তিদের শায়েস্তা করতে পারবে। সে একটু হেসে বলে– আপনারে কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো, তা আমি বুঝতি পাত্তিছিনে, সরদার সায়েব।

সরদার সাহেব আবার বলেন: ধন্যবাদের কোনো দরকার নেই কমান্ডার। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আজ রাত থেকে মুক্তিরা না-আসা পর্যন্ত দুই তিন জন রাজাকার অস্ত্র নিয়ে আমার বাড়ির আশপাশে লুকিয়ে থাকবে। আমার বিবিও জানবে না, এমন সাবধানে থাকবে তারা। জমির যুদ্ধে আসলেই একবার বাড়ি আসবে মা'র সাথে দেখা করতে। আমাদের কপাল ভালো হলে সোনার চান ময়না পাখি খাঁচায় আটকাতে কষ্ট হবে না।

ছমির সরদারকে আবারও ধন্যবাদ জানায় কমান্ডার। তারপর বলে– আপনার কথামতোই কাজ হবে। দোয়া করবেন চাচা।

সেদিন রাত থেকেই চারজন রাইফেলধারী রাজাকার সরদার সাহেবের বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়ে পজিশন নেয়।

পরদিন সকালেই ছমির সরদারের ডাক পড়ে রাজাকার ক্যাম্পে। কমান্ডার তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। তারপর বলে– কালই আপনার কথা জানানো হয় উপরের বড়ো লিডারকে। তিনি আপনারে মোবারকবাদ জানাইছেন। এহনিই তিনি আইসে পড়বেন।–বলতে বলতেই বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। কমান্ডার দৌড়ে যায় অফিস ছেড়ে। সরদার চেয়ারে বসে থাকেন।

একটু পরেই বড়ো লিডার কমান্ডারের রুমে ঢোকেন। তিনি সরদার সাহেবকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন: উই আর ভেরি সরি চাচা। আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। যে-মানুষ পাকিস্তানের জন্য নিজের ছেলেকে কোরবানি দিতে পারে, তাকে জানাই হাজার সালাম। আপনার তুলনা আপনি নিজেই। এমন নতিজা সবাই দেখাতে পারলে মুক্তি ব্যাটারা দু'দিনেই ভ্যানিশ হয়ে যাবে। চাচা, আপনার জন্য সুসংবাদ আছে। আপনাকে এখানকার শান্তিকমিটি এবং রাজাকার বাহিনীর সম্মানিত উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। আজ থেকে আপনি এই ক্যাম্পের মুরব্বি, মানে সবার উপরে। আপনি এখানেই থাকবেন। মুরব্বি হিসেবে এখানকার রাজাকারদের ভালো-মন্দ সব আপনি দেখভাল করবেন, এদেরকে উপদেশ-নির্দেশ দেবেন। এই যে আপনার চিঠি। সরকার বাহাদুর আপনার উপর খুব খুশি হয়েছেন।

এতক্ষণ একটানা কথা বলে থামলেন বড়ো লিডার। কমান্ডার শহিদউদ্দিন মারহাবা মারহাবা বলে করমর্দন করে ছমির সরদারের সাথে। সরদার জবাবে শুধু বলেন–'আলহামদুলিল্লাহ'।

ছমির সরদার আজই ক্যাম্পে উঠেছেন। বাড়িতে শুধু জমিলা বেগম, কাজের বুয়া সখিনা আর কাজের ছেলে রশিদ। সরদার বিকেলে ক্যাম্পে যাওয়ার সময় সবাইকে সাবধান করে দিয়ে গেছেন– খবরদার, সন্ধ্যার পর কেউ ঘরের বা'র হবা না। তা'হলি কিন্তু বিপদ হবে। আমি গেলাম।

স্বামীর কথায় জমিলা বেগম একটুও ভয় পান না। কোনো কথাও বলেন না তিনি। তার জন্য বরং আরো ভালোই হলো। তারা নিরিবিলি থাকতে পারবেন। সরদারের হাউকাউ-চেঁচামেচি শুনতে হবে না– এসব কথা ভাবতে ভাবতে এক-টুকরো হাসি ফুটে ওঠে জমিলা বেগমের ঠোঁটে; অনেক দিন পর তিনি হাসলেন। তার বুকটা এখন বেশ হালকা লাগছে।

সন্ধের একটু আগে জমিলা বেগম পুকুরপাড়ের দিকে যাচ্ছেন। তার মনে হাজার চিন্তার ঝড়। ছেলে জমির মুক্তিযুদ্ধে গেছে। কোথায় আছে, কী করছে, কেমন

আছে–এসব চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। হঠাৎ তিনি দেখতে পান– তার জমিরের বয়সি একটি ছেলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটার পরনে একটা পুরনো ছেঁড়া লুঙ্গি আর গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। সে জমিলা বেগমের কাছাকাছি এসে বেশ জোরেই বলে– আম্মা গো! আমি এক ন্যাংড়া ফকির গো আম্মা! আমারে দুইডা পয়সা ভিক্ষে দেন গো আম্মা!

জমিলা বেগমের মনটা কেঁদে ওঠে ওর কথায়। আহা রে, এমন কচি ছেলেডার এমন অবস্থা! মুহূর্তেই তিনি অবাক হয়ে শুনতে পান, ছেলেটি নিচু স্বরে বলছে– চাচি, আমি আসলে ন্যাংড়া ফকির না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। জমির ভাই আমাগের কমান্ডার। দু'-এক দিনির মদ্দিই আমরা এহানকার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ কত্তি আসপো। আমরা এ্যাহন এই এলেকাতেই আছি। রেকি কত্তিছি। তা চাচি, জমির ভাই আগামী পরশু রাত ঠিক বারোটার সময় আপনার সাথে দেহা কত্তি আসপে। আপনি সজাগ থাকপেন। তাহলি এ্যাহন আসি চাচি..

জমিলা বেগম আঁচলের গিঁট খুলে 'ল্যাংড়া ফকির'কে 'ভিক্ষে' দেওয়ার অভিনয় করলেন আর সেই ফাঁকে বললেন– না, ও যেন বাড়ি না আসে। বিপদ হবে। রাতে কারা যেন অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, আমি টের পাইছি। যাও, তারে ক'বা– সে যেন দেশ স্বাধীন না করে বাড়ি না আসে। যুদ্ধে জিতে গাজি হয়েই যেন সে আমার সামনে আসে। তুমি এখন যাও বাবা।

ছেলেটা আগের মতোই ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে পাশের বাঁশবনের সরু পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এদিকে রাজাকারেরা খবর পেয়েছে– খুব তাড়াতাড়ি এই ক্যাম্পে হামলা চালাবে মুক্তিযোদ্ধারা। দিনক্ষণ ঠিক ঠিক না জানলেও হামলার ব্যাপারে তারা বেশ নিশ্চিত। কিন্তু দশ দিন পার হয়ে গেলেও রাজাকার-ক্যাম্প আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে কমান্ডার রেড অ্যালার্ট উঠিয়ে নিল এবং স্বাভাবিক ডিউটির নির্দেশ দিল রাজাকার-রক্ষীদের। শহর থেকে কিছু স্পেশাল ফোর্স আনা হয়েছিল এই ক্যাম্পে। তারাও আজ চলে গেল। ক্যাম্পে এখন বেশ ঢিলেঢালা ভাব। সবাই যেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। প্রধান উপদেষ্টা ছমির সরদারও আছেন খোশ মেজাজে। তিনি তেল-চকচক বেতের লাঠিটা বাতাসে একটু ঘুরিয়ে মজা করে বলেন– মুক্তি পাখিরা আমাদের পাকিস্তানি বন্দুকের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে। হয়তো সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওদের মামুবাড়ি গিয়ে উঠেছে। আরে, এই ক্যাম্পে খাস পাকিস্তানি মর্দে মুমিন ছমির সরদার রয়েছে; এখানে মুক্তিরা হামলা করতে সাহস পাবে না– তোমাদের আমি সাফ বলে দিলাম। –বলতে বলতে মিষ্টি হাসিতে ভরে যায় সরদারের সারা মুখ।

ক্যাম্পের সব খবরই গুপ্তচরের মাধ্যমে ধলগ্রামের গোপন ঘাঁটিতে জমির কমান্ডারের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত। তার বাবা ছমির সরদারের আজকের কথাগুলোও তার কানে যায়। তার মুখেও এক-টুকরো হাসি ফুটে ওঠে চকিতে; যার মানে বোধ হয় এই– বাপজান, বাপেরও বাপ আছে!

জমির অন্য সহযোদ্ধাদের নিয়ে মিটিঙে বসে। তার অভিমত, স্পেশাল ফোর্স ক্যাম্প ছেড়ে গেছে। রাজাকারেরা বেশ হালকা মেজাজে আছে। আমরা আজ রাতেই ওদের আক্রমণ করব। তোমাদের কী মত?

সবাই একবাক্যে কমান্ডারের কথায় সম্মতি জানায়– হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। আজই বাঘারপাড়া ক্যাম্পে হামলা চালাতে হবে।

ওইদিন রাত ঠিক একটা এক মিনিটে রাজাকার ক্যাম্পে ফায়ারিং শুরু করল জমিরের বাহিনী। ওর সাথে আশিজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার এক চৌকষ দল। ওদের গোলাগুলির জবাবে ক্যাম্প থেকেও পাল্টা গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল; তার মানে, রাজাকারেরা সজাগ এবং তৈরি আছে। জমির হাত ইশারায় সাথিদের নির্দেশ দেয় ফায়ারিং বন্ধ করতে। কারণ, সে জানে– গেরিলা যুদ্ধে আসল অস্ত্র হল কৌশল; এতে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকে। এখন ওদেরকে সেই কৌশলেরই আশ্রয় নিতে হবে। ফায়ার ওপেন করাটাও ছিল কৌশলের অংশ– শত্রু কতটা সজাগ আছে, তা এর মাধ্যমে পরখ করা হলো।

মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ারিং বন্ধ করলেও রাজাকারেরা আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে গেল। শেষমেশ প্রতিপক্ষের আর কোনো সাড়া না পেয়ে তারাও গুলি বন্ধ করে। তারা ভাবে– মুরব্বি সরদার সাহেবের কথাই ঠিক– মুক্তিরা হয়তো ভয়েই পালিয়ে গেছে। কিন্তু না। ওরা পালায়নি। চিত্রা নদীর ঢালুতে ঘন পাটক্ষেতে ঘাপটিমেরে বসে আছে। জমির পরিকল্পনা করে– আরো অন্তত এক ঘণ্টা ওরা চুপ করেই থাকবে, কোনো গুলি ছুড়বে না। এতে রাজাকারেরা ভাববে– মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যি পালিয়েছে। তখন ওরা চারটি দলে ভাগ হয়ে আচমকা চার দিক থেকে শাঁড়াসি আক্রমণ চালাবে। দুটি মেশিন গান, চারটি এলএমজি, রাশিয়ান কালাশনিকভ রাইফেল আর হ্যান্ড-গ্রেনেড অনেকগুলো রয়েছে সাথে। এসব অস্ত্র ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে রাজাকারদের হারানো কঠিন হবে না। কোন কোন অস্ত্র কে কে কখন, কীভাবে, কোন পজিশনে থেকে ব্যবহার করবে সে-সমন্ধে ডিটেইল নির্দেশনা দেয় কমান্ডার জমির।

ঠিক এক ঘণ্টা পর অচমকা ফায়ারিং শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে। রাজাকারেরা এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল– মুক্তিরা আজ নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে ভেগেছে। কিন্তু এ আবার কী গজব শুরু হলো! মেশিন গান, এলএমজি আর

রাইফেলের গগনবিদারী আওয়াজে কানে তালা লাগার অবস্থা। মাঝে মাঝে গ্রেনেডের বিকট শব্দ– তা যেন ক্যাম্পের বিভিন্ন রুমের মধ্যে বিস্ফোরিত হচ্ছে বলে রাজাকার কমান্ডার শহিদউদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা ছমির সরদারের মনে হয়। ওরা ভাবতেই পারছে না– মুক্তিরা এত কাছাকাছি পজিশনে এল কী করে! ওরা একটা ঘর থেকে যুদ্ধের গতিবিধি পরখ করছে আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলছে– চালায়ে যাও, চালায়ে যাও। বিষ্টির মতো গুলি চালাও। ভয় পা'বা না। মনে রাইখো– মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় পায় না তারা। তাদের চীৎকার অনুসরণ করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জমির এগিয়ে আসে সেদিকে। তারপর আকাশ ফাটানো শব্দে চীৎকার করে বলে– হ্যান্ডস্ আপ!! তোমাদের ক্যাম্পের পতন হয়েছে। সব রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম। তোমাদের সব অস্ত্র আর গোলাবারুদ এখন আমাদের কব্জায়। হাতের অস্ত্র ফেলে দাও; নইলে এই মুহূর্তে তোমাদের মাথার খুলি উড়ে যাবে!

ছমির সরদার আর শহিদ কমান্ডারের হাতের অস্ত্র আপনা-আপনি খসে পড়ে। দু' হাত ওপরে তুলে দাঁড়ায় দু'জন। কিন্তু এ কার গলার স্বর!–এত ভয়ের মধ্যেও ছমির সরদারের মনে এ-প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তাই ওই অবস্থায়ই তিনি প্রশ্ন করেন–তুমি কে গো? গলার স্বরটা বড়ো চেনা চেনা লাগছে..

জমির আরো এগিয়ে যায়। এরই মধ্যে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে আসে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলে– জমির ভাই, আপনি সরে আসুন। আমরা ওদের দেখছি– বলেই ছেলেটি অস্ত্র দুটি নিজের কব্জায় নিয়ে ছমির সরদার আর রাজাকার কমান্ডার শহিদউদ্দিনের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধে। জমির সবই দেখে, কিন্তু কিছু বলে না।

ছমির সরদার জমিরের নাম শুনেই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে– বাবা জমির, আমারে বাঁচা! আমি তোর জন্মদাতা বাপ!

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জমির বাবার কথার কোনো জবাব দেয় না। শুধু সহযোদ্ধাদের কড়া গলায় আদেশ দেয়– টেক্ দেম আউট!

এখন এই দুই বন্দি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জমিরের কাছে শুধুই রাজাকার, দেশের শত্রু– এছাড়া আর কিছুই ভাবছে না সে। ওর কাছে এই মিরজাফরদের আর কোনো পরিচয় নেই, থাকতে পারে না!♦

২৭ ডিসেম্বর মির্জা গালিবের জন্মদিন

মির্জা গালিবের শেষ দিনগুলো

ড. মাহফুজ পারভেজ

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের উর্দু-ফারসি গজল ও কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা কবি মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিবের (২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯) সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-তাড়িত বিশ্ববাসীর সম্পর্ক ক্রমেই আবার নতুন করে গভীর হচ্ছে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি ও তার কবিতা বৃহত্তর পাঠক সমাজের নিকটবর্তী হচ্ছেন।

মির্জা গালিবের প্রেমময়তা, মরমীবাদ, কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং তির্যক মন্তব্য-নির্ভর সমকালীন পরিস্থিতির বয়ানসমূহ আকৃষ্ট করছে একালের মানুষদেরও। বইয়ের পাতার দূরতম অক্ষরের চেয়ে অনেক অনেক কাছে চলে আসছেন তিনি। তিনি গভীর নিবিড়তায় উচ্চারিত হচ্ছেন মানুষের হৃদয়ের মর্মমূলে। অথচ তার সাথে একালের ব্যবধান দেড় শতবর্ষের। ২০২০ সালে তার মৃত্যুর ১৫১ বছর অতিক্রান্ত হলেও তার কাব্য জীবন্ত।

কবিতা ও গজলে গালিব যে তীর্যকতা, রহস্যময়তা, প্রেমময়তার আনন্দ ধ্বনি ও বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছেন, মানুষ তা আগ্রহ ভরে শুনছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায় মরমী কবি রুমি যেমনভাবে বেস্ট সেলার, দক্ষিণ এশিয়ায় গালিবকে নিয়েও তেমনভাবে চর্চা বাড়ছে। ভাষিক গণ্ডি পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক আইকন।

গালিবের সঙ্গে আমাদের পরিচিয় অনুবাদের মাধ্যমে এবং উর্দু বা ফারসি জানা মাওলানাদের বয়ানের বরাতে। বাংলার সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়ে কোনও গবেষক বিস্তারিত না জানালেও, গালিব যে কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন, সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৮২৮ সালে এসে প্রায় দেড় বছর কলকাতায় ছিলেন গালিব। উর্দু ভাষায় রচিত 'সফর-এ-কলকাত্তাহ্'-তে তিনি লিখেছেন, 'কলকাতার মতো এমন মন জয় করা জমিন তামাম দুনিয়ার আর কোথাও নেই।'

কলকাতায় গেলে গালিবের স্মৃতিধন্য জায়গাগুলো ঘুরতে ঘুরতে চোখের সামনে যেন ফিরে আসে যুগ সন্ধিক্ষণের ছবি: মুঘল জমানার শেষ আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুরুর ইতিহাস-গন্ধী দিনগুলো। মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিট বা সিমলা বাজারের পথে-প্রান্তরে গালিবের উপস্থিতির ইতিবৃত্ত টের পাওয়া যায়। কানে বাজে মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক সুষমা গালিবের কণ্ঠস্বরের আবছা প্রক্ষেপে।

মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিব জন্ম নেন আগ্রায় আর বেড়ে উঠেন দিল্লিতে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরলেও তার মৃত্যু হয় ৭২ বছর বয়সে দিল্লিতে। পুরনো দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের সন্নিকটে এক জীর্ণ কবরগাহে শেষশয্যায় শায়িত আছেন উর্দু ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠতম এই কবি ও গজল রচয়িতা।

২০১৯ সালের শরতকালে দিল্লির মেহেরআলি এলাকা পেরিয়ে বস্তি নিজামুদ্দিনের পুরনো কাঠামোতে প্রবেশের সময় সঙ্গে ছিল সদ্য-কলকাতায় গালিব স্মৃতিধন্য জায়গাগুলো ছুঁয়ে আসার তাজা স্পর্শ। দিল্লি তখন তপ্ত বায়ু দুষণে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ছাপ পুরো শহরে। আরও ছিল নাগরিকতা আইন নিয়ে উত্তাল

জনবিক্ষোভ, যা পরে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে চরম দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িকতার অমানবিক রূপ পরিগ্রহ করে বহু মানুষের আহত-নিহত হওয়ার এবং সীমাহীন ঘর-বাড়ি, সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে।

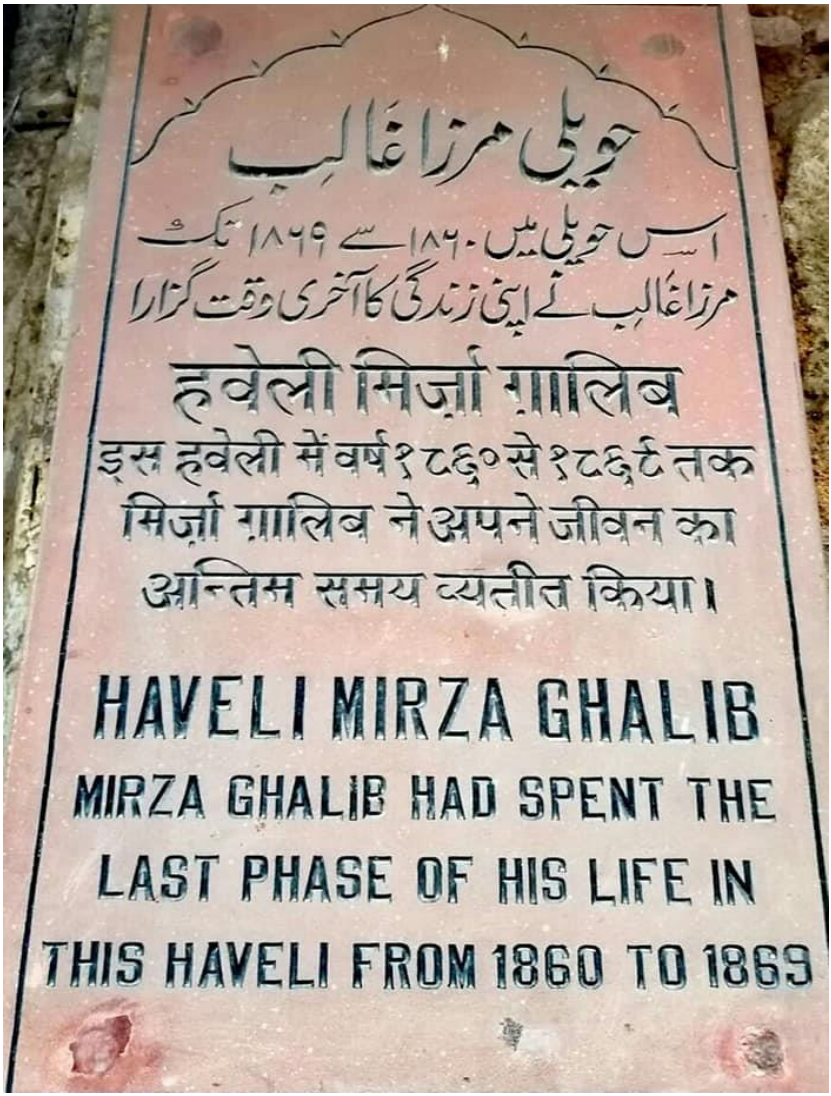

১৮৬০ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত মীর্জা গালিবের শেষ জীবনে আবাসস্থলের সামনে ফলক

মোটেও অবাক না হয়ে পায়ে হেঁটে গালিবের কবরগাহের দিকে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক। যে কবির জীবন কেটেছে যুগ-সন্ধিক্ষণে,

বিদ্রোহের আগুন ও বিক্ষোভের বারুদের মধ্যে, তার কাছে যাওয়ার জন্য শান্ত পরিস্থিতি আশা করাও ভুল। কারণ, স্বয়ং গালিব, ঐতিহ্যবাহী দিল্লি নগরে ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন ও নির্যাতনের সাক্ষী। লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে সুরম্য নগরকে নরকে পরিণত করার বীভৎসতা তিনি দেখেছেন বুক-চাপা যন্ত্রণায়। এখনও তিনি কবরের নিরবতায় শুয়ে দেখছেন হিংসা ও শক্তির মত্ততা।

অতি সাধারণ একটি পথ-নির্দেশক সাইন বোর্ড না থাকলে গালিবের কবরটি খুঁজেও পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ। দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ ছাড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে গেলে দেখা পাওয়া যায় গালিবের সাদামাটা সমাধির। গালিবের জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা মনে হলে বুঝা যায়, কত অনাদরে ও অবহেলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক প্রতিভা। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম, যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে ছোট করে দেখে, তা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়। সব কিছু চলে আসে দখলদার ঔপনিবেশিক ইংরেজের হাতে। ক্ষমতা, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সবই কব্জা করে ইংরেজ কোম্পানি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যাবতীয় প্রতীক ও উপাদান ধ্বংস করতে থাকে। গালিব টের পান, পরিবর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে দিল্লি শহরের শান-শওকত-জৌলুস ও সংস্কৃতির মতো তার নিজের জীবনও অবক্ষয় আর অন্ধকারে ক্রমঅপসৃয়মান।

মহাযুদ্ধের পরের বছর, ১৮৫৮ সালের এপ্রিলে গালিব লেখালেখি সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেন। অতীতে কী করে যে এতো লিখেছেন, সে বিষয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। তিনি মগ্ন হন ঈশ্বরচিন্তায়। ডুবে যান তাত্ত্বিকতার নানা ভাবনায়। গালিব নিজেই লিখেছেন, 'অমানুষিক জীবন সংগ্রাম করেও মানুষকে কেন গ্রাস করে অসাফল্য ও শূন্যতাবোধ', এই ভাবনাই তাকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলে নিজের জীবনের শেষপাদে।

গালিব এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিরূপতা, নিজের বার্ধক্য, স্বাস্থ্যের অবনতি, হতাশা ও প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অপরিসীম ক্লান্তিবোধের ফলে স্বাভাবিক জীবনছন্দের প্রতি তিনি ক্রমেই আকর্ষণ হারাতে থাকেন। ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে গালিব এক চিঠিতে লিখেছেন: 'আমার ক্ষেত্রে জীবনের কতটুকুই বা আর বাকি। এরপর আমি প্রভুর কাছে যেতে পারবো, যে স্থান ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম এসব বোধের অতীত। সেখানে কোনও শাসককেই ভয় পাবার কিছু নেই। ভয় পাবার নেই

গুপ্তচরদেরও। আর সেখানে রুটিও সেঁকতে হয় না। সে এক আলোর পৃথিবী, শুদ্ধতম আনন্দের স্থান।'

পরলোক সম্পর্কে গালিবের গৌরবান্বিত অনুভব তার ধর্মচেতনার চূড়ান্ত অবয়বকে চিহ্নিত করে। আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে তিনি বৌদ্ধিক গভীরতায় সমস্ত জাগতিক সন্তাপকে ধর্মচিন্তার বাতাবরণে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেন। গালিবের এই মনোদার্শনিক উত্তরণ আরও স্পষ্ট হয় ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসের এক রচনায়: 'জীবনের বেশিটাই কেটে গেছে, তবে যেটুকু বাকি পড়ে আছে, সেটুকুও ভালোভাবে কাটানো দরকার। এতো কাসিদা (প্রশস্তি) লিখে কবি উরদি এমন কী অর্জন করেছেন যে, আমিও আমার কাসিদার বিজ্ঞাপন দেবো? বোস্তান লিখে সাদি কী পেয়েছিলেন? তাফটা কী পেয়েছেন সমবালিস্তান লিখে? আসলে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ধোঁয়াশা ও অস্তিত্বহীন। সেখানে না আছে কবি, না আছে কবিতা, না আছে গাথা, না আছে গীতিকার। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিই আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।'

অথচ শেষ জীবনের এই আস্তিক গালিবের সঙ্গে তার প্রথম জীবনের লাগামহীনতার বিরাট ফারাক দেখা যায়। একদা তিনিই ছিলেন বেহিসাবি, ভোগমত্ত, স্বার্থচেতনা ও জাগতিক জীবনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব। তিনি ছিলেন ভারসাম্যহীন ও আত্মঅহমিকাবোধের আকাশচুম্বী গর্বের প্রচারক। ফলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি প্রকৃত অর্থে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ও দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের মানুষ। তার মানসিকতার একদিকে রয়েছে উদাসীনতা ও ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যদিকে রয়েছে ভোগপ্রিয়তা, অহংকার, আত্মঅহমিকা ও যোগ্যতা থাকার পরেও বার বার ব্যর্থতা ও অসফলতার উপস্থিতি।

এমনই দোদুল্যমান সত্ত্বায়, বিপরীত ব্যক্তিত্বে প্রবল মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে কেটেছে গালিবের শেষ দিনগুলো। ১৮৫৭ সালে, তার বয়স যখন ৬০ বছর, তখন রাজনৈতিক অভিঘাতে যে চরম আঘাত ও বিরূপতার দেখা তিনি সমাজে ও নিজের জীবনে পেয়েছিলেন, তাকে সঙ্গী করেই তিনি হতাশাচ্ছন্নভাবে আরও ১২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভয়াবহ আতঙ্কের দিনগুলোকে তিনি ভুলতে পারেননি।

ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে ১৮৫৭ সালের মে মাসের এক সকালে রাজধানী দিল্লি শহরে বিপ্লবী সিপাহীদের ঢুকে পড়া দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারের অন্যতম সদস্য হয়েও তিনি এ ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততা

রাখেননি। কিন্তু নারকীয় তাণ্ডবতায় ব্রিটিশের ফিরে আসার রক্তস্রোত গালিব সহ্য করতে পারেননি।

চারমাস বাদে ব্রিটিশরা যখন দানবের মতো আগ্রাসনে দিল্লির পুনর্দখল কায়েম করে, তখনও গালিব নিজের কষ্ট চেপে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তারপরেও তার ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল ও সহ্যের বাইরে। হতভাগ্য হাজার হাজার নগরবাসীর মতো দুর্ভাগ্য বরণ করে তাকে মরতে হয়নি বটে, কিংবা দিল্লির মতো একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হননি তিনি, তথাপি তিনি পদ, পদবি, মর্যাদা, অর্থ, বিত্ত, গৃহহারা হন।

ব্রিটিশদের নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞে গালিব হয়েছিলেন দিশেহারা ও অস্থির। তিনি লিখেছেন সেই অবস্থার কথা: 'দিল্লি যেন কোনও মৃতের শহর। যা কিছু পুরনো তার দু-গালে থাপ্পড় মেরে নতুন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রতীকগুলো ক্রমেই উঠে দাঁড়াচ্ছে।' এই বিপুল প্রতিহিংসা ও ঘৃণায় রক্তাপ্লুত ও সশস্ত্র পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী গালিব ক্রমেই হয়ে পড়েন দরিদ্র, নিঃসঙ্গ, বাকরুদ্ধ এক মানুষ, যার কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পায় হাহাকারের ঐতিহাসিক ভাষাচিত্র:

'রক্তের এক সমুদ্র চারপাশে উত্তাল হয়ে উঠেছে
হায়রে! তারা সব কোথায় গেলো?
ভবিষ্যতই বলবে আর কী কী আমাকে এরপরও দেখে যেতে হবে!'

এমনই ঘোরতর সঙ্কুল পরিস্থিতিতে গালিবের শেষ দিনগুলো ঘনিয়ে আসতে থাকে। মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই গালিব মাঝে মাঝে চেতনা হারাতে থাকেন। কিন্তু, শেষ নিঃশ্বাস অবধি তার মন সজাগ ছিল। মৃত্যুন্মুখ গালিবকে যারা দেখতে এসেছিলেন, তাদের ভাষ্যে সেকথা জানা যায়। তারা দেখেছিলেন, শয্যাগত কবি চরম শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পরেও বই পড়ছেন। তার দুর্বল বুকের ওপর ধরা ছিল দিওয়ান-ই-কানি, তার দৃষ্টিও সেই বইয়ে নিবদ্ধ ছিল।

দর্শনার্থীদের প্রতি গালিব জানিয়ে ছিলেন তার চরমতম অবস্থার কথা:

'তোমরা কি লক্ষ করেছ যে আমি কতটা দুর্বল? আমার পক্ষে ঘোরাফেরা কতদূর শক্ত? তোমরা কি আমার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির অবস্থা লক্ষ করেছ? আর আমি কোনও মানুষকেই দেখে চিনতে পারি না, আমার ম্রিয়মান শ্রবণক্ষমতাও নিশ্চয় তোমাদের অনুমানে এসেছে। প্রাণপণে কানের কাছে চেঁচালেও কোনও শব্দই আর আমি শুনতে পাই না। তবে যাবার আগে জেনে যাও যে, একটিমাত্র ক্ষমতা আমার আজও অক্ষত, তা হলো খাবার ক্ষমতা। তাই জেনে যাও, আমি কী খাই, আর তার কতটা পরিমাণেই বা খাই?'

গালিবের অননুকরণীয় কৌতুকবোধ এবং মনের ঋজুতা শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তার কানে আসা তার সম্পর্কে নানা গুজব ও অতি-কথনের জবাব শেষ

শয্যাতে শুয়েও তিনি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে দিয়েছিলেন। নিজের ক্ষুধার্ত ও পীড়িত পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের ভাষায়।

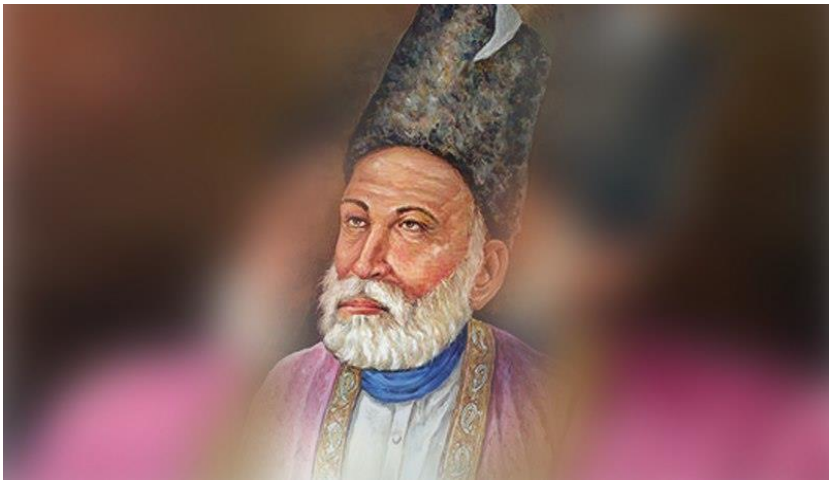

মৃত্যুর আগের দিন গালিব কয়েক ঘণ্টা কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর কিছুক্ষণের জন্য চেতনাপ্রাপ্ত হন। সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করে বলেন, 'কেউ জানতে চেয়ো না যে কেমন আছি। দু'একদিন পরে আমার প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিও।' অন্তিম দশায় তিনি আবৃত্তি করেন:

'আমার মৃত্যুন্মুখ নিঃশ্বাস এখন দেহ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
ওহে আমার বন্ধুরা, এখন শুধুমাত্র আল্লাহ
একমাত্র আল্লাহই বিরাজ করছেন।

১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রোগাক্রান্ত মির্জা গালিবের জীবনাবসান হয় ভোরের দিকে। তাড়াতাড়ি করে দুপুরবেলাই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, একজন জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ কবির জন্য সমাজে শোক প্রবাহিত হচ্ছে এবং সরকারি-বেসরকারি মহলের সব মানুষ ছুটে এসেছেন। বরং অনাদর ও দায়সারা ভাবে কাছের কতিপয় লোক গালিবের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। কারোও মধ্যেই এমন বোধ ছিল না যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার শেষ বিদায় দিচ্ছেন। একজন অতি সাধারণ নাগরিকের শেষযাত্রার মতো সম্পন্ন হয় তার সকল ধর্মীয় ও সামাজিক আচার। দুনিয়া থেকে গালিবের চলে যাওয়া ছিল করুণ ও নিঃসঙ্গ যাত্রার নামান্তর।

নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পর গালিবকে পার্শ্ববর্তী সুলতানজি কবরগাহে সমাহিত করা হয়। এটি ছিল সেই পবিত্র তীর্থস্থান, যা অবস্থিত ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের পাশে। আর তা ছিল লোহারু বংশের পাবিবারিক কবরগাহ।

গালিবকে করবস্থ করার সময় সামান্য যে ক'জন বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান, হাকিম আহসানউল্লাহ ও নবাব মোস্তাফা খান শেফটা। অন্তিমযাত্রা ও আনুসাঙ্গিক খরচের টাকাগুলোও গালিব রেখে যেতে পারেননি, সে ব্যয়ভার বহন করেন লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান।

জীবনের মতো মৃত্যুতেও গোলমাল হয় গালিবকে নিয়ে। অল্প কয়েকজন শবযাত্রীর মধ্যে প্রশ্ন উঠে শেষকৃত্যের নিয়মগুলো নিয়ে। বিতর্ক শুরু হয়, শিয়া না সুন্নি মতে গালিবের শেষকৃত্য হবে, তা নিয়ে। আলোচনায় এই বিবাদ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। গালিব তার জীবনকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন এবং তার বক্তব্য এতোই নানামুখী অর্থ বহন করেছে যে, তাকে পাক্কা মুসলিম বা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন বলে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি শিয়া বা সুন্নি বলেও প্রমাণ করা যায়।

গালিবের বিশাল জীবন ও বহুবিচিত্র কর্মে বহুমাত্রিকতার সমাধান তার শব নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা গালিব সম্পর্কে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত টানতে থাকেন। পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়লে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান ফয়সালা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি গালিবকে সুন্নি মতে গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

গালিব তার মৃত্যুচিত্র নিজেই অংকন করে রেখেছিলেন কবিতার আখরে। এপিটাফের ভাষায় বলেছিলেন এমনই অমোঘ কথা, যা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল তার গোরের সামনে শেষ বিশ্রামের সময়কালে:

'বিপদ বিধ্বস্ত গালিবের অভাবে
কোনও কাজই কি
থেমে থেকেছে?
এত কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই
প্রয়োজন নেই
উচ্চস্বরে বিলাপ করবার।'

আসলেই, কোনও মতে দায়িত্ব পালন করতে আসা ইংরেজ-বিধ্বস্ত দিল্লির কয়েকজন নিকটজন ও প্রতিবেশী অতিদ্রুত কবর দিয়ে ফিরে আসেন গালিবের কাছ থেকে। কোনও কান্নাকাটি বা বিলাপের প্রশ্নই ছিল না, বরং একজন অন্য রকম বাকপটু ও তির্যক মন্তব্যকারী মানুষ বিরূপ ও সঙ্কুল পরিস্থিতিতে বিদায় নেওয়ায় নাগরিকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু একদিন সবাই যাকে একাকী ও অবহেলা ভরে কবরে শুইয়ে চলে এসেছিলেন, অবশেষে তার কাছেই ফিরে এসেছে সমগ্র দক্ষিণ

এশিয়া। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উচ্চতর শিখার মতো দীপ্যমান গালিবের দিকে প্রবল নান্দনিক তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে উপমহাদেশের শত কোটি মানুষ।

মাত্র নয় বছর বয়সে ফারসিতে কবিতা রচনার মাধ্যমে আগ্রায় জন্ম নেওয়া মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষপাদে দিল্লিতে রূপান্তরিত হন মির্জা গালিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজকবি হওয়ার পথ তার জন্য সহজ ছিল না এবং রাজনৈতিক পালাবদলে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে ব্রিটিশরাজ কায়েমের প্রেক্ষাপটে তার সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনিও কম হৃদয় বিদারক নয়।

আসলেই ইতিহাসের বহু ভাঙা-গড়ার সাক্ষী মির্জা গালিবের জীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর, যা দেখা যায় তার লেখা চিঠিপত্র, কবিতা, গজল, দিনপঞ্জিতে। মির্জা গালিবের জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে উদ্ভাসিত হয় মধ্যযুগের ভারত থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে নতুন যুগের সূচনাকাল এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, সাংস্কৃতিক বিন্যাস ও ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীর উত্থান-পতনের অতি নির্মম-বাস্তবতার ছবি, যে ছবি ইতিহাসের ধুসর পাতা ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে আসে রক্তাপ্লুত বর্তমানের দিনগুলোতে আর মানুষ ও মানবতাকে ভাসিয়ে নেয় হিংসা ও ঘৃণার প্রজ্বলিত আগুনে।

১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর গালিব যখন আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে চলছে পরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। বাবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনে বিস্তৃত সুবিশাল ভূভাগ কমে সীমাবদ্ধ হয় দিল্লি এবং আশেপাশের সংক্ষিপ্ত এলাকায়। ১৮৫৭ সাল নাগাদ পুরো ক্ষমতা চলে আসে দখলদার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির কব্জায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশদের নারকীয় সামরিক নৃশংসতা ও অমানবিক তাণ্ডব দিল্লিতে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সফল হয়।

গালিব দেখেন তার প্রিয় শহর উপদ্রুত। রাজকীয় পরিবারের সদস্যরা নিহত। দরবার ও পুরনো নিয়ম গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবগণ নির্বাসনে। দিল্লির চাঁদনিচকে প্রতিদিন অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, স্থাপনা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পশুর মতো মারতে মারতে নারী, শিশু, বৃদ্ধদের পর্যন্ত নিঃশেষ করা হচ্ছে। এমনই সঙ্কুল ও উপদ্রুত পরিস্থিতিতে গালিবের দিন কাটে দারিদ্র্য ও ভীতিতে, মৃত্যু আর ধ্বংসের দৃশ্য দেখতে দেখতে।

এরই মাঝে ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর রেঙ্গুনে নির্বাসিত ও বন্দি শেষ মুঘল সম্রাট আবদুল জাফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে গালিব আরও নিঃসঙ্গ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এই সম্রাট শুধু তার শাসকই ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু

ও সহযাত্রী-কবি। গালিব আফসোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিখলেন, 'বাহাদুর শাহ একই সঙ্গে কারাগার এবং তার নশ্বর দেহের আধার থেকে মুক্তি পেলেন।'

কিন্তু গালিবের মুক্তি সহজে হয়নি। তিনি হারানো মর্যাদা, ভাতা ফিরে পাওয়ার জন্য পথে-পথে ঘুরতে বাধ্য হলেন। দিল্লির পাশের ঐতিহ্যবাহী শহর লক্ষ্ণৌ গিয়েও ব্যর্থ হন। নতুন শাসক ব্রিটিশদের দফতরে আর্জি জানাতে উত্তর ভারত থেকে সুদূরের কলকাতায় উপস্থিত হলেন এবং সবক্ষেত্রেই চরম ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে আসেন দিল্লিতে। সেই প্রিয় অথচ প্রায়-পরিত্যক্ত, প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরেই ধার-দেনা-কর্জ করে অতিকষ্টের জীবন-যাপন করতে থাকেন তিনি। রাজসিক কবিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রহণ করতে হয় প্রায়-দেউলিয়ার অভিশপ্ত জীবন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সালে মির্জা গালিব যখন মারা যান তখন তিনি নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন ও প্রায়-বিচ্ছিন্ন একজন গুটিয়ে যাওয়া মানুষ। জীবন থেকে চলে যাওয়ার অপেক্ষাই তার একমাত্র অবলম্বন আর স্রষ্টার প্রযত্নেই তার একমাত্র আশ্রয়। গালিবের শেষ আশ্রয়ের পাশে একটি বিকেল কাটিয়ে আমার চোখে দীন-হীন-জীর্ণ কবরগাহ নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় করুণ রাজনৈতিক ইতিহাসের চলমান চালচিত্র এবং দিল্লিতে নৃশংসতার ফিরে আসার উন্মত্ত পদধ্বনিই ভেসে আসছিল। আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছিল উপমহাদেশের যুগ সন্ধিক্ষণ, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও সাংস্কৃতিক উথাল-পাতালের একেকটি অতিকায় ঢেউ।

পাহাড়গঞ্জের হোটেলে ফিরে দিল্লির সে রাতে আমার ঘুম হয় না। ডায়েরির পাতা খুলে অনেক আগে মির্জা গালিবকে নিয়ে রচিত আমার একটি কবিতা পড়তে পড়তে রাত কেটে যায়। পাশের করলবাগের দিগন্ত আলোকিত হওয়ার আগেভাগে দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদ থেকে ফজরের আজানের সুরেলা ধ্বনিতে অনিন্দ্য ভোর এসে টোকা দেয় জানালায়। সদ্য-বিগত রাতের গহ্বরে জমা থাকে পুরনো দিল্লির অবহেলিত কবরগাহের অপসৃয়মান ছায়া আর গালিবের উজ্জ্বলতম সান্নিধ্যের স্পর্শ। হৃদয়ে পুঞ্জিভূত হয় ঘুমহীন গালিবের শহরের আস্ত একটি রাত জেগে থাকার স্মৃতি, যে শহরের আরেক প্রান্তে কবরের নির্জনায় জেগে আছেন স্বয়ং মির্জা গালিব, শুনছেন অতীতের সমান্তরালে বর্তমান হয়ে প্রবহমান ঘৃণা ও হিংসার মাতাল উল্লাস।♦

লেখক : প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

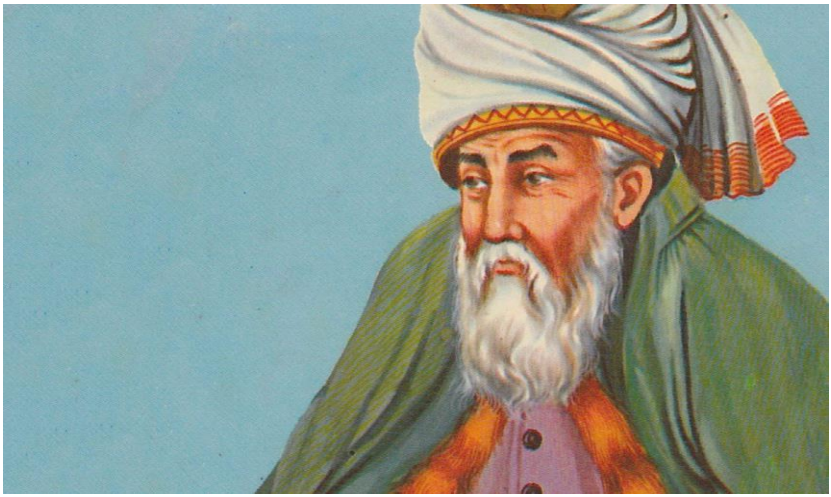

জালাল উদ্দিন রুমি, মৃত্যু ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩

৮১৩ তম মৃত্যু বার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

মসনবীয়ে রুমি

বন্ধুত্বের প্রোজ্জ্বল বন্ধন

জব্বার আল নাঈম

প্রেম, ভালোবাসা, জাগতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি, আত্মার অনুসন্ধান, পথ ও পরমের সান্নিধ্যে বন্ধুত্ব হয়। আবার শত্রুকে ঠেকাতেও বন্ধুত্ব হয়। যদিও এমন বন্ধুর সংখ্যা সমাজ-জগতে অধিক হারে। এখানে স্বার্থ সরাসরি আঙুল তোলে। অস্ত্র ও অর্থের উৎস প্রাসঙ্গিক হয়। অর্থকে অতিক্রম করতে পারে জগতে খুব কম সংখ্যক মানুষ-ই। কেউ কেউ অতিক্রম করে হয়ে গেছেন মহামানব। মহাত্মা। এমন একজন জাগতিক ব্যক্তির নাম জালালউদ্দিন রুমি। আনাতোলিয়ার উপদ্বীপ বালখে জন্ম নেয়া এই রুমি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ক্রমেই নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশ

করতে শুরু করেন। জ্ঞানের পরিসীমা বাড়াতে উঁচুস্তরের আত্মার সন্ধানে ছুটতে থাকেন মাইলের পর মাইল। ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পরিক্রমায় কাঁচা সোনারও সন্ধান মিলতে থাকে। কিন্তু জানেন না কিভাবে নিজেকে পুড়িয়ে রূপান্তর ঘটাবেন। এরপর মাসনবীর শরীরে সাজিয়ে সৌন্দর্যের চূড়ান্ত উপলব্ধিটা করবেন। ক্লান্ত হয়ে পথ ছাড়তে চাইলেন না বরং সূর্যের আলোয় নিজেকে জ্বালিয়ে রূপান্তরের চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন।

রুমির বন্ধুত্ব তালিকায় যুক্ত হয় সমাজের ধনী ও দরিদ্রের অভিজ্ঞতা। মেষ পালক থেকে রুমের সেলজুক শাসক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ বিন কায়কোবাজ, আবার চোর, ডাকাত থেকে শুরু করে পরমের পথের ফকির আবু হামিদ বিন আবু বাকর ইব্রাহিম ওরফে ফরিদ উদ্দিন আত্তার। প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা পৃথিবী। মানুষকে জানলে পৃথিবীর কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিষ্কার দেখায়। শুদ্ধ ও সুন্দর মনে হয়। পবিত্রতা যখন পদ স্পর্শ করে তখন মঙ্গলডাকাত দলের কবল থেকে রুমিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন কায়ি গোত্রপতি ও সাগুত বাজারের রক্ষক আর্তুগ্রুল। পরবর্তীতে এই সাগুত হয় আর্তুগ্রুলপুত্র প্রথম ওসমানের রাজধানী। বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়, মওলানা রুমি সাগুত দর্শনেও এসেছিলেন। প্রেম বিলি করতে এসে বলেছেন, 'আমার প্রথম প্রেমের গল্প শোনা মাত্র তোমাকে খুঁজতে থাকি! কিন্তু জানি না ওটা কতটা অন্ধ ছিল। প্রেম আসলে কোথাও মিলিত হয় না। সারাজীবন এটা সবকিছুতে বিরাজ করে।' এমন সত্য অস্বীকার করা কঠিনের শামিল। প্রেম সর্ব মহলে বিরাজমান। উপলব্ধির দরজায় যে দাঁড়ায় সে-ই কেবল স্পর্শ করে প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

রুমির প্রেমের প্রথম ছবক হয় আত্তারের ছোঁয়ায়। তাঁর বালক বয়সে বাবা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ বালখ রাজার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে হিযরত করেন। এমন পরিভ্রমণে রুমি বিভিন্ন মনীষীদের সংস্পর্শে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় নিজেকে সুসংহত করেন। আঠার বছর বয়সে মক্কার পথে নিশাপুরে দেখা মিলে পারস্যের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তারের। বাবার দলের পেছনে আত্মার বন্ধু রুমিকে হাঁটতে দেখে সম্ভবত সী মোরগের এক দর্শন উপলব্ধি করলেন আত্তার। বললেন, 'একটি হ্রদের পেছনে একটি সমুদ্র ছুটে যাচ্ছে।' এটা সীমালঙ্ঘন! এটা মেনে নেয়া যায় না। তখন দিকভ্রান্ত বন্ধুর কব্জি ও কাঁধ ধরে নিজেকে অন্বেষণের সন্ধানে ছুটতে বললেন। উপহার হিসেবে দিলেন ইহজগতের আত্মার অনুসন্ধানমূলক বই 'আসারনামা'। বই নিয়ে রুমি সন্ধান থেকে অনুসন্ধান করেছেন নিজেকে। আত্মার সব গরিমাকে ধ্বংস করার কৌশল ও প্রচেষ্টায় মগ্ন থেকেছেন। সত্যের উপর না দাঁড়ালে সৌন্দর্য উপলব্ধি করা কঠিন। মানুষ চেনা

আরো কঠিন। মিথ্যার ভিত সব সময় দুর্বল হয়। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা ক্রমশ কমতে কমতে শূন্যের কোটায় পৌঁছে। আত্তার আত্মার অনেক পথের সন্ধান দিলেন রুমিকে। এমন জলে কারো পিপাসা মিটে না। তাই পূর্বের চেনা পথে কেউ ফিরেও আসতে চায় না। রুমিও ফিরলেন না। বরং নিশাপুরে নতুন নতুন নেশায় উন্মুখ থাকলেন। পিতা-মাতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ এবং মুইমিনা খাতুন চিন্তায় পড়ে গেলেন! পথ হাঁটতে থাকলে পথের শেষ নেই। সন্ধান-অনুসন্ধানেরও শেষ নেই।

জালালুদ্দীন রুমি'র ভাস্কর্য

জীবনের কিছু অতৃপ্তিতে হাত রেখে তৃপ্ত হতে কারামানে থাকাবস্থায় জাওহার খাতুনকে বিয়ে করেন সদ্য আঠারোর যুবক। মহাসমুদ্রের পানি কখনই পান করে শেষ করা সম্ভব নয়। জ্ঞান তার চেয়ে বড়ো মহাসমুদ্র। রুমি জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাতে প্রতিনিয়ত সমাজ ও বিশ্বের বিজ্ঞ মানুষের সন্ধানে ছুটতে থাকলেন। কোনো বাঁধাই তাঁকে আটকাতে পারেনি। বরং তিনি যেন উচ্চারণ করলেন,' শোক প্রকাশ হতে পারে সমবেদনার বাগান। যদি সবকিছুতে নিজের হৃদয়টাকে উদার রাখতে পারেন, বেদনা আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারে।' এই মহাত্মা খুব ছোটো থেকেই বেদনাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিজেকে খাঁটি সোনা বানিয়েছেন। খাটির সঙ্গে খাঁটির বন্ধন ভালো হয়, নকলে খাদ পড়ে। অবিশ্বস্ততা তৈরি হয়। তাই রুমি ছিলেন খাঁটির সন্ধানে। কিন্তু তিনি জানেন না, এই খাঁটি কে? এই খাঁটি কি? এই খাঁটি জিনিস এক জীবনে পাবেন কি পাবেন না। তবুও অন্বেষণ থামালেন না।

০২

পিপাসুক মওলানা জালাউদ্দিন রুমির জ্ঞানের পিপাসা কোনোভাবেই মিটছে না। তাও-তে-চিং এ 'চুয়াং-ৎসে'র কথায় খানিক মুগ্ধতা বেড়ে গেল।

'জ্ঞানের মধ্যে এর সন্ধান করলে
সে সন্ধান বৃথা, এর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না!
চেষ্টা করেও একে লাভ করতে চাইলে
সে চেষ্টা বৃথা, এ সকল চেষ্টার উপরে!
তর্ক করে একে আয়ত্তে আনতে গেলে
সে তর্ক বৃথা, এর কাছে তর্কের অবকাশ নেই।'

রুমি জানালা খুলে বাইরে তাকাতে চাইলেন, দরজা খুলতে চাইলেন ঘরের। বের হতে চাইলেন মহাজাগতিকের সন্ধানে। জগৎ আলোকিত করা সৈয়দ বুরহান উদ্দিন মোহাক্কিকি তীরমিযির স্নেহে দীর্ঘ নয় বছর ইসলামের শরীয়া এবং সূফীবাদের ইলমও গ্রহণ করলেন। তবুও যেন প্রেমের মরা জ্বলে ডুবছে না। কারণ, জানেন না। হয়ত সঠিক কোনো স্পর্শ, সঠিক ছোঁয়ার অভাব এখনও পাওয়া হয়নি এই উপলব্ধিটা এতদিনে বুঝে গেছেন জালালউদ্দিন রুমি।

রুমি আত্মজিজ্ঞাসার সামনে বসে বললেন, বন্ধু, 'তোমার জন্ম হয়েছে পাখা নিয়ে, উড়ার ক্ষমতা তোমার আছে। তারপরও খোঁড়া হয়ে আছো কেন!' একটি পাখি তখন ডেকে ডেকে উড়ছে কোনিয়ার আকাশে। পাখিটি ক'দিন ধরেই উড়ছে। মাঝে মধ্যে রুমির ঘরের পাশের গাছটিতেও এসে বসে। বিশ্রাম নেয়। মনের আনন্দে ডাকে। আবার চলেও যায়। কোথায় যায় রুমি জানেন না। একদিন সত্যি সত্যি চলে যায়। ফিরে না। রুমি খুব কষ্ট পায়। তবু অপেক্ষায় সলতে

আগুন ধরায়। এবার অপেক্ষার অবসান ঘটে। রুমির বয়স তখন সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ। চালচুলোহীন ভবঘুরে সেই পাখিটির নাম শামস তাবরেজি। কথিত আছে, রুমির বয়স যখন একুশ তখন তাবরেজি তাঁর দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েছিলেন। তারপর আবার নিরুদ্দেশ। শামস মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ অবস্থায় অজানার অনুসন্ধান করছেন আর বলছেন 'কে আমার সঙ্গ সহ্য করিবে।' অদৃশ্য নির্ভীক কণ্ঠে জানাল, 'বিনিময়ে তুমি কি দিবে?' জবাবে শামস বললেন, 'আমার শির!' কণ্ঠটি আবার বলল, 'তাহলে তুমি যার সন্ধানে নেমেছ সে কোনিয়ার জালাল উদ্দিন।' এর সত্যতা আমরা পরবর্তীতে পেয়েছি। হারানো রুমিকে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকেন শামস। সন্ধানে থাকলে অন্তর সজাগ থাকে। পেয়ে গেলে কখনও কখনও কপাট লাগে। এমন বিশ্বাস হয়ত ছিল শামস তাবরেজি নামক পাখিটির। এর বিনিময়-বাস্তবায়ন ঘটে শামস তাবরেজির শির বিচ্ছেদের মাধ্যমে।

বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম সাক্ষাতের কথিত গল্পটি 'মসনবীয়ে রুমি' বইয়ের অনুবাদক আবদুল মজিদ উল্লেখ করেছেন, 'একদিন মাওলানা রুমি হাওযের কিনারায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে কতিপয় কিতাব রক্ষিত ছিল। হযরত শামস তাবরেজি হঠাৎ এসে জানতে চাইলেন 'এগুলি কি? মওলানা উত্তরে বললেন, 'ইহা বিজ্ঞান দর্শনের কথোপকথন, এগুলোতে তোমার কি মতলব?' কথা শুনে শামস কিতাবগুলো হাওযের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ইহাতে রুমির অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগিল। শামসকে সম্বোধন করিয়ে রুমি বলিলেন, 'ওহে দরবেশ! তুমি এমন সম্পদ বিনষ্ট করিয়াছ, যাহা এখন আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এই কিতাগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সুক্ষতত্ত্ব লিপিবদ্ধ ছিল, যাহার বিনিময় দুস্প্রাপ্য।' ইহা শুনিয়া শামস তাবরেজি হাত ঢুকাইয়া সমস্ত কিতাব হাওযের মধ্য হইতে উঠাইয়া কিনারায় রাখিয়া দিলেন। সমুদয় কিতাব পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল, আদ্রতার লেশমাত্রও উহাতে ছিল না।' ইহাতে মাওলানা অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। শামস তাবরেজি বললেন, 'ইহা বাস্তব জগতের অবস্থাসমূহের বিষয়বস্তু, তুমি ইহা কি বুঝিবে?' এমন ঘটনার মধ্য দিয়েই দু'জনের প্রথম সাক্ষাত ঘটে। এই সাক্ষাত মূলত বিশ্বসাহিত্য বদলের সাক্ষাত ছিল। প্রেমে প্রগাঢ় রহস্য উদঘাটনের সাক্ষাত ছিল। পরমকে পাওয়ার আরাধনাও ছিল। এভাবেই আলাপ-আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। রুমি বুঝতে পারলেন, তাঁর জানার বাইরের জগত বেশ অসীম। মাশরিক-মাগরিব নেই। সকাল-সন্ধ্যা শব্দটি সেই অভিধানে অচ্ছুত। এমন প্রজ্ঞা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে দূরে সরায় যে সে নিশ্চিত আহাম্মক! রুমি বাড়িতে এনে থাকার ব্যবস্থা করে সমাদর

করলেন। ততদিনে রুমি চল্লিশ বছরের সোনালি ফসল ঘরে তুলে সঞ্চয়ের খাতায় কিছু অভিজ্ঞতাও জমা করেছেন। খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করেননি তিনি।

০৩

রুমির বক্তব্য-ই যেন সত্য, সুন্দর ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, 'প্রতিটি মানুষকে একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং সেই কাজটি তার হৃদয়ে গ্রন্থিত আছে। প্রতিটি মানুষ ভেতর থেকে ঠিক সেই কাজটি করার জন্যই তাড়না অনুভব করে।' রুমি প্রেমের তাড়না অনুভব করলেন। দুটি আত্মাকে এক করে সূর্যের মতো নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন। এবার রুমির উচ্চারণগুলো তীক্ষ্ম ও শক্তিশালী। বললেন, 'এটা তোমার আলো, তোমার আলোই এই জগতকে আলোকিত করে।' অথচ অনেকেই নিজেকে বুঝতে পরেনি। কিংবা উর্বর অনুসন্ধান করে পৌঁছতে পারেনি নিজের কাছে নিজে।

জালালুদ্দীন রুমি'র স্মৃতি ভাস্কর্য

রুমির সুযোগ্য সারগেদ সিপাহশালার দেখলেন, রুমি নিজের বাসস্থান ত্যাগ করে শামসের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সালাউদ্দিন জাকুব নামক স্বর্ণব্যবসায়ীর হুজরায় দু'জনে তিন থেকে ছয় মাস চিল্লাকাশী করেন। এশকে এলাহীর অমৃত এবং মহাব্বতে প্রার্চুযের রূহানী খোরাকে শামস তাবরেজি নিজেকে সকল প্রকার খাবার ও পানাহার থেকে বিরত রাখলেন। প্রেমে বেপরোয়া হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করলেন। এমতাবস্থায় সপ্তাহখানেক ধরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতেন। সাধারণ জ্ঞান ফিরলে একটি রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে আবার প্রেমে মগ্ন হতেন প্রেমে। শামস তাবরেজির সাহচর্যে রুমির অবস্থাও একই দিকে গড়ায়।

সালাউদ্দিন জাকুব ছাড়া তাদের সন্নিকটে কেউ ঘেঁষতেও পারতেন না। এমতাবস্থায় দু'জন দু'জনকে ছাড়া এক মুহূর্তও কাটাতে পারছেন না। চারপাশে ছড়িয়ে গেলে দরবেশ শামস তাবরেজি এসে মাওলানা রুমিকে জাদু-টোনা করে পাগল বানিয়েছে। মূলত রুমির সঙ্গে যাহের এলেম ও প্রার্থিবতার বিচ্ছেদ ঘটছে। অথচ লোকেরা বলছে, মাওলানা ওয়াজ নসিহত করছে না। আমাদেরকে হেদায়েতের বক্তব্য শোনায় না। অদেখা এক লোকের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ভেসে যাচ্ছে খড়-কুটার মতো।

অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে রুমির মেলামেশা বাড়াবাড়ি রকমের বলে মনে করছেন রুমির পরিবার ও সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা। এমন মনে করাকে রুমি উড়িয়ে দেন। তাবরিজির সান্নিধ্যে রুমির 'সম্মানহানি' ঘটছে। রুমির পরিবার ও সমাজ থেকে তাবরিজিকে বিভিন্ন হুমকি-ধমকি অব্যাহত রাখলে তিনি কোনিয়া ছেড়ে দামেস্কে অবস্থান নেন। রুমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে বড়ো ছেলে সুলতান ওয়ালাদ শামসকে কোনিয়া ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। এত বড়ো ও বিশাল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একা থাকতে নিঃসঙ্গ অনুভব করেন রুমি। চারপাশে কোনো মানুষ নেই। ছায়াকে কখনই প্রকৃত মানুষ বলা যাবে না। সত্যিকারের মানুষ হলেন শামস তাবরেজি। আকাশের মতো বিশাল পরিধি যাঁর। সত্যিকারের মানুষরা এরকমই হয়। এমন উপলব্ধি থেকেই পরবর্তীতে জালালউদ্দিন রুমি হয়ত লিখেছেন, 'আকাশ কেবল হৃদয় দিয়েই ছোঁয়া যায়।' তেমনিভাবে বন্ধু শামস তাবরেজিকে ধরতে গেলে সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অচেনারে কেউ ধরতে পারে না, এমনকি সেটা দামি হলেও। রুমি প্রিয় বন্ধুকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার লক্ষে সৎ মেয়ে কিমিয়া খাতুনকে ষাটোর্ধ্ব শামস তাবরেজির সঙ্গে বিয়ে দেন। অথচ ছোটো ছেলে আবদুল্লাহ চেলেবি কিমিয়াকে ভালোবাসতেন। আলাউদ্দিন চেলেবি সাতজন সহযোগির সহযোগিতায় পিতা রুমির অজান্তে শামস তাবরেজিকে খুন করে কবরস্থ করেন।

তাবরেজির এমন মৃত্যু বা হারিয়ে যাওয়া বন্ধু রুমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। বন্ধুর সন্ধানে তিনি আবারও মধ্যপ্রাচ্য সফরে বের হয়ে দামেস্ক এসে থামেন। কিন্তু কোথাও প্রিয় বন্ধুর সন্ধান পেলেন না। রুমি খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দেন। এবার নিজের ভেতর বন্ধুকে খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে বলতে থাকেন,

'কে বলে, যে অমর সে মারা গিয়েছে?
কে বলে, আশার সূর্য মারা গিয়েছে?
ওই দেখো, এ তো সূর্যের শত্রু যে ছাদে এসেছে,
এবং চোখ বন্ধ করে চীৎকার করে বলছে, 'হে, সূর্যের মৃত্যু।'

সূর্যের কোনো কারণে মৃত্যু ঘটলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। রুমির কাছে শামস তাবরেজি হলেন সেই সূর্য। যে সূর্যের আলোয় পৃথিবী হাঁটছে সৃজনশীলতার পথে। মানুষ উন্মুখ হয়ে এখনও গ্রহণ করছে মাওলানা রুমির কবিতা। যে কবিতায় প্রাণ আছে, আত্মার অস্তিত্ব আছে, সবুজের সমারোহ আছে, প্রেমের মনজিল আছে। আছে আরো অনেক কিছুর রকমফেরও।

মধ্যপ্রাচ্য তন্ন তন্ন করে খোঁজা শেষে শামস তাবরেজিকে না পেয়ে কালো পোশাক পরিধান করে বাড়ির পথ ধরেন। এমন বন্ধু, এমন শিক্ষক দ্বিতীয় কেউ হয় না। এমন বন্ধুকে হারানো যায় না। ভোলাও যায় না। রুমি বন্ধুকে আত্মায় ধারণ করলেন। দুটি বিন্দুতে এক করলে একবিন্দুতে পরিণত হয়, রুমিও তাই করলেন। শামসকে আত্মায় ধারণ করে। এমন বন্ধুকে ন্যানো সেকেন্ডের জন্যেও ভুলে থাকা কঠিন। তাই তিনি বলেন,

'তুমি চলে গেলে আমার চোখ দিয়ে রক্ত বাহিত হলো। আমি কেঁদে কেঁদে রক্তের নদী বহালাম। দুঃখগুলো শাখা-প্রশাখা বেড়ে বড়ো হলো, দুঃখের জন্ম হল। তুমি চলে গেলে, এখন আমি কীভাবে কাঁদব? শুধু তুমি চলে গেছো তা-ই নয়, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তো আমার চোখও চলে গেছে। চোখ ছাড়া এখন আমি কীভাবে কাঁদব প্রিয়!'

রুমি সেই কান্নাকে বিসর্জন দিয়ে লিখতে থাকলেন অনবরত। লেখার মাধ্যমেই বন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস ও পরিকল্পনা। শুধু তাঁকে নিয়ে লেখাই নয়, রুমি লিখে সেই কবিতা প্রকাশ করছেন শামস তাবরেজির নামে। বুঝাতে চাইছেন রুমি আর তাবরেজি আলাদা কেউ নন। আত্মা দুটি হলেও এক সত্ত্বার অধিকারী। রুমির প্রথম মহাকাব্যগ্রন্থের নাম হয় 'তাবরিজ শহর থেকে শামসের সমষ্টিগত কবিতা'। শামস ছন্দনামে লেখা কবিতার সংকলনের নাম পরবর্তীতে হয় 'দেওয়ানে শামস'। রুমি যেখানে যেতেন শামস তাবরেজির সন্ধান করতেন। কারণ, এই তাবরেজির মাধ্যমেই রুমি পেয়েছিলেন আত্মার রহস্য, পরমের সন্ধান, চিন্তার বাইরের জীবন-জগত ও বোধের পরিপূর্ণ বিকাশ। মানুষ স্রষ্টার সন্ধানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ ভিড় জমায়। বাস্তবে স্রষ্টাকে পেতে হলে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। শামসের ভাষায় তখন রুমির উচ্চারণ, 'আমি সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজছিলাম। তাই আমি মন্দিরে গেলাম, সেখানে তাকে খুঁজে পেলাম না। আমি গির্জায় গেলাম, সেখানেও তাকে পেলাম না। এরপর আমি মসজিদে গেলাম সেখানেও তাকে পেলাম না। এরপর আমি নিজের হৃদয়ে তাকে খুঁজলাম, সেখানে তাকে খুঁজে পেলাম।'

সৃষ্টিকর্তা থাকেন মুমিন মানুষের হৃদয়ের ক্যানভাসে। তাকে পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন ভালোবাসাই সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। হয়ত এজন্য বলেছিলেন,

'স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর অজস্র পথ আছে। তার মাঝে আমি প্রেমকে বেছে নিলাম।'

জালালুদ্দীন রুমি'র মাজার শরীফ

০৪

প্রেমিক মন প্রেম ছাড়া কখনই সুস্থ থাকতে পারে না। দিওয়ানা রুমিও পারলেন না। তিনি নতুন প্রেমে জড়ালেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী শেখ সালাউদ্দিন জাকুবের সঙ্গে। তাঁর মাঝে শামস তাবরেজির অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। জাকুবের কাউনিয়ার দোকানে হাতুড়ি দিয়ে যখন স্বর্ণ পেটানো হতো, তখন এক ধরনের শব্দ কম্পন তৈরি হয়, সেখান থেকে সুর ও শব্দ পেতেন রুমি। উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করতেন। মারেফতের গোপন জ্ঞানে মগ্ন হতেন বন্ধু জাকুবের সঙ্গে। লিখতে থাকলেন অসংখ্য কবিতা। সালাউদ্দিন জাকুবের সঙ্গের সম্পর্ক কোনো শক্তিই ছিন্ন করতে পারেনি। দু'জনেই যেন একটি আত্মা। বরং তারা দিন-রাত এমনকি সপ্তাহ ও মাস প্রেমে মশগুল থেকে আধ্যত্মতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে চাইতেন। জাকুব ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে কঠিন সাধনায় নিমগ্ন হলেন। তাদের প্রেমে পানি ঢেলে তাজা করতে চাইলেন হুসামউদ্দিন চেলবি নামের রুমির এক ছাত্র। হুসামও

আধ্যাত্মতার দিকে ধীরে ধীরে যেতে থাকলেন। রুমি-জাকুব বন্ধু জুটির কথা তখন সকলের মুখে মুখে। তাঁকে আরো কাছে পেতে রুমির ছেলে সুলতান ওয়ালাদের সঙ্গে জাকুবের মেয়ের বিয়ে দেন। শামসের তিরোধানের পর সালাউদ্দিন হয়ে গেলো রুমির সবচেয়ে কাছের স্বজন। টর্চলাইটের আলো যেমন দিনে পুরোটা প্রকাশ পায় না, তদ্রুপ হৃদয়ের আলোও হৃদয়ের ঘঁষা ছাড়া কখনও কখনও কম বিকশিত হয়। দু'জনের অন্তরঙ্গতা স্বজন-পরিজন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। বরং শামস তাবরেজি ছিলেন অতিউত্তম। তাঁর বিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা ছিলো অসীম। এইদিকে জাকুব একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। কিন্তু মাওলানা সব কানাঘুষা উপেক্ষা করে দশ বছর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখেন কেবল প্রেমের দর্শনে। একদিন হঠাৎ শেখ সালাউদ্দিন জাকুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর পরমের সন্ধানে ৬৫৭ হিজরির ১ মহররম শারীরিকভাবে চিরবিদায় নিলে তাঁকে কবরস্থ করা হয় রুমির পিতার কবরের কাছে।

প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে রুমির অন্তরে আগুন প্রজ্বলনের শুরু হয়। তিনি নির্বাচন করলেন হুসামউদ্দিন চেলবিকে। শামস এবং স্বর্ণব্যবসায় জাকুবের মতোই হুসামের সঙ্গে প্রগাঢ় মহব্বত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরমাত্মার সন্ধানে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। হুসামের অবর্তমানে মাওলানাকে বিমর্ষ ও বিষণ্ন দেখাত। এসময় মাওলানা পরিবারের স্বজনদের চাইতেও হুসামকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি চাইতেন হুসাম যেন সব সময় পাশে উপস্থিত থাকেন, যাতে ফয়েযের সমুদ্র প্রেমে ও প্রজ্ঞায় পরমের দিকে প্রবাহিত হয়। এই সুযোগে হুসাম মাওলানা রুমিকে অনুরোধ করলেন, ফরিদউদ্দিন আত্তারের 'মানতিকে তাইয়ার' বা পাখির সমাবেশ-এর মতো একটি কিতাব রচনায় মনোযোগী হতে। রুমি তখনই মাথার পাগড়ি খুলে লিখিত আঠারোটি বয়েত উপস্থাপন করলেন।

সেই থেকে শুরু হয় 'মসনবীয়ে রুমি' লিখার কাজ। লিখতে সময় লাগে ১৫ বছর। যাতে বয়েত সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ হাজার। মাসনবীয়ে রুমির বেশির ভাগ লেখাই রুমি তাঁর প্রিয় তিন বন্ধু শামস তাবরেজি, শেখ সালাউদ্দিন জাকুব এবং হুসামউদ্দিন চেলবি'র প্রেম ও ভালোবাসার প্রগাঢ় নিদর্শনকে ফুটিয়ে তোলেন। এখানে সুফিবাদের ছড়ান্ত ইমারত, প্রকৃতির নির্যাস, জীবন-দর্শনের বাস্তব জ্ঞান, সত্য ও সুন্দরের দৃশ্যপট, সাহসের সমাহার, ক্রোধ ও ভালোবাসার শিক্ষা, হিংসার পরিণাম ও তার নিদর্শন নিয়ে রচিত হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্য কিতাব 'মসনবীয়ে রুমি'। তবে, পুরো বইয়ে অদৃশ্যভাবে রয়েছে রুমির বয়োজৈষ্ঠ্য বন্ধু ফরিদউদ্দিন আত্তারের দর্শনের ছায়া। যা এখনও মানুষের হৃদয়ের কথা বলে। বলবে আগামী দিনগুলোতে।♦

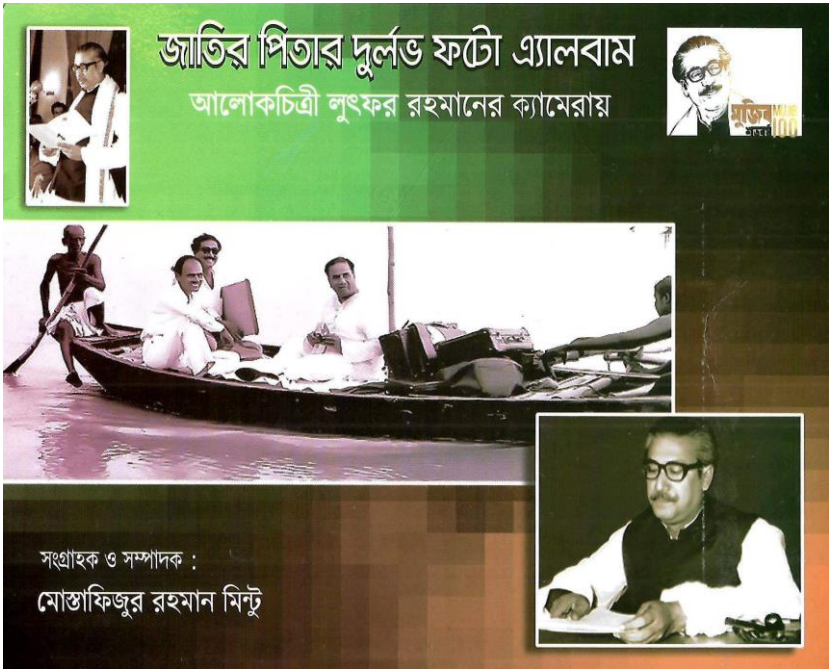

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন

আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান

অগ্রপথিক প্রতিবেদন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মুহূর্তের দুর্লভ ছবি সম্বলিত একটি অ্যালবাম যা ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান দলিল– 'জাতির পিতার দুর্লভ ফটো অ্যালবাম আলোকচিত্রী লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় শীর্ষক বইটি'। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জুন ২০২০সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রাহক ও সম্পাদক তার সন্তান চিত্রগ্রাহক মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু।

ইতিহাসের অধ্যায়গুলো সংরক্ষণ করা জাতির মৌলিক দায়িত্ব। তারই অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি, প্রামাণ্য তথ্য, দুর্লভ ছবি নিয়ে প্রকাশ করেছেন জাতির পিতার দুর্লভ ফটো অ্যালবাম আলোকচিত্রী লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় শীর্ষক বইটি। ৬৪ পৃষ্ঠার অফসেট পেপারে স্ক্যানিং করা ছবির বই। মূল্য দেশে ১২২ টাকা এবং বিদেশে ৪ ইউএস ডলার। বইটির সূচিপত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফটো অ্যালবাম ৯-৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এরপর লুৎফর রহমানের লেখা :

ক. কবিতা 'চিরঞ্জীব'

খ. শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ. একটি ছবির মূল্য

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের সেই সব স্মৃতি

ঙ. শেখ রাসেলের সেই ছবি

চ. গৌরী প্রসন্ন মজুমদার তার গানে বেঁচে থাকবেন।

বইটিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মুহূর্তের দুর্লভ ছবি দেখে জাতি অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পুরো ধারণা তৈরি করতে পারবে। বইয়ের প্রতিটি লেখা পাঠককে ঋদ্ধ করবে বলে মনে করি।

হাতেগোণা যে কয়েকজন আলোকচিত্রী বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ চিত্র ধারণ করেছেন তার মধ্যে একজন মরহুম লুৎফর রহমান। দীর্ঘ ৪৫ বছরের কর্মময় জীবনে প্রয়াত লুৎফর রহমান ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণা, ৭০'র নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অসংখ্য দুর্লভ ছবি তুলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ও ঘরোয়া মুহূর্তের বহু মূল্যবান ছবি তার ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। যা কালের সাক্ষী। ইতিহাসের দৃশ্যপট হিসেবে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, পড়বে।

বঙ্গবন্ধু ইতিহাস তৈরি করেছেন আর তার নির্দেশে ইতিহাসের সচিত্র উপস্থাপনার কারিগর ছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী মো. লুৎফর রহমান। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই অসাধারণ কাজগুলো নতুন মাত্রা এনেছে।

সময়টা ছিল ব্রিটিশ ভারতের শেষের দিকে রয়াল এয়ারফোর্সে ছোট একটা চাকরির সুবাদে একদিন এক বৈমানিক বলল, তোমার ধুতি পাঞ্জাবিটা পরে একটা ছবি তুলতে চাই। আর ছবিটা তুলবে তুমি। বলে তার ১২৭ বেবী ব্রাউনি

ক্যামেরাটা তুলে দিল ১৬ বছরের এক উদ্দাম যুবকের হাতে, কোন ইংরেজ সাহেবকে সরাসরি না বলার দুঃসাহস কোন বাঙালির ছিলো না। অথচ দৃঢ়চেতা যুবকটি বিনয়ের সাথে বললো, আমি আমার ধুতি, পাঞ্জাবি দিতে পারি কিন্তু ক্যামেরা চালাতে জানিনা। বৈমানিক তাকে ক্যামেরা চালানের কৌশল শিখিয়ে দিলেন। যুবকটি আত্মবিশ্বাসের সাথে চমৎকার ছবি তুললো। তখনকার এনালগ ক্যামেরায় সাদা কালো ছবি তোলার জন্য ক্রিটিক্যাল শার্পনেস ও ভালো কম্পোজিশন ছিল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু প্রথম ক্যামেরা হাতে মো. লুৎফর রহমানকে অপরিচিত কিংবা আনকোরা ফটোগ্রাফার মনে হয়নি। যার প্রমাণ তার কাজের মুন্সিয়ানায় তিনি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি ফটোগ্রাফিকে নিজের ধ্যান ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্থানে ধারণ করে কিনে ফেলেন ১২০ আগফা বক্স ক্যামেরা। এসময় তিনি রাজশাহী শহরে অবস্থান করেন এবং একই সাথে স্টুডিও ফটোগ্রাফি ও প্রেস ফটো কাভারেজের কাজ করে প্রশংসিত হন। অসহায় গরীব ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি ছবির বিনিময়ে কোন পয়সা নিতেন না।

রাজশাহী শহরে কিংবা উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বড় কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা হলেই ডাক পড়তো লুৎফর রহমানের। ষাটের দশকের প্রথমার্ধেই তিনি রাজশাহীর বিশিষ্ট নাগরিকদের সান্নিধ্যে আসেন। তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। উত্তরবঙ্গের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের প্রতিষ্ঠাকালীন দুর্লভ সব ছবির কারিগর ছিলেন এই প্রতিথযশা আলোকচিত্রী শিল্পী।

১৯৫৪ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাজশাহী সফরে এসে প্রথমবারের মত লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দী হন। এভাবেই বাঙালি জাতির ইতিহাসের একেকটি কালজয়ী মুহূর্তগুলো চিত্রিত করতে থাকেন এই গুণী শিল্পী।

বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামে গর্জে উঠেছে তার ক্যামেরা ফ্লাশ। ছয় দফা আন্দোলনের পর লুৎফর রহমানের ভাবনায় আসে জাতীয় পর্যায়ের সকল ঘটনাকে তিনি চিত্রিত করবেন। এ মনোকামনা থেকে তিনি রাজশাহী থেকে ঢাকায় চলে আসেন।

বঙ্গবন্ধুর তোলা ছবিগুলো নিয়ে সরাসরি হাজির হন বাঙালির স্বাধীনতা, স্বকীয়তা রচনার লেখক জাতির পিতার সামনে। বঙ্গবন্ধু সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন আর বলেছিলেন চালিয়ে যেতে। এরপরে চালিয়ে গেলেন লুৎফর রহমান তার ক্যামেরা। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন, ৭ মার্চ ১৯৭১ এ ঐতিহাসিক

ভাষণ, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, '৭২ বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা, অনেক দুর্লভ ঐতিহাসিক ছবি তুলে নিজেও ইতিহাসের অংশে হয়ে গেছেন এই ক্যামেরাম্যান।

১৯৭২ সালে ৫ টাকা, ১০ টাকার নোটে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংযোজনের জন্য যে চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল তাতে লুৎফর রহমান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবিটি শোভা পাচ্ছে এই মুদ্রাগুলোতে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে সাথে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক সংগঠকদেরও ছবি তুলেছেন এই গুণী শিল্পী। এই মুদ্রাগুলো মীরপুরের ঢাকা জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৯৭২ সালের ২৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইউইলকিনশন কোম্পানির পক্ষ থেকে ইয়াসিকা ম্যাট ১২৪ জি ক্যামেরা তৎকালীন হোটেলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল আলোকচিত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। কোম্পানিটির কর্মকর্তারা সে সময় ৫ ও ১০ টাকার এক খণ্ডের টাকাও তাকে উপহার দেয়া হয়।

তার সৃষ্টিকর্মগুলো এখনো উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে। ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে বাংলাদেশ সচিবালয়ের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যালকনিতে।

তিনি রেডিও পাকিস্তানের মুখপত্র এলহান ম্যাগাজিনে কাজ করতেন। দেশ স্বাধীনের পরে বাংলাদেশ বেতারে। বেতার বাংলায় তার তোলা অনেক ছবি ছাপা হয়েছে।

সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের অনেক খ্যাতিমান তারকাদের ছবি তুলেছেন। এর মধ্যে হেমন্ত মুখোপ্যাধ্যায়, রুনাা লায়লা, মেহেদী হাসান, আব্দুল আলিম, ফেরদৌসী রহমান অন্যতম। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও অনেক ছবি তুলেছেন এই শিল্পী।

শুধু ক্যামেরা হাতেই নয় কলম বইটিতে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদন করে প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতা 'চিরঞ্জীব'। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু খুশি হয়ে তাকে ম্যাট-১২৪ জি ক্যামেরা উপহার দেন।

তার লেখা প্রবন্ধ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সচিত্র বাংলাদেশসহ অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কালের সাক্ষী ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।♦